স্বপ্ন দৃষ্টা।

পারিবারিক উপন্যাস।

শ্রীমতি নূরন্নেছা খাতুন।

১৩৩০।

দাম—১৲ টাকা। কাপড়ে বাঁধা ১৷৹ টাকা

উৎসর্গ।

স্নেহের ফাতেমা,

তুমি বয়সে আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট হইলেও জ্ঞান বুদ্ধিতে আমার চেয়ে বড় ছিলে। পিঠোপিঠি জন্ম সুলভ বাহ্যিক ঝগড়া বিবাদের পরিবর্ত্তে, শিশুকাল হইতে আমাদের দুটীর গভীর ভালবাসা ও একতা দেখিয়া, আত্মীয় স্বজনগণ প্রায়ই বলিতেন, রাণী ফাতেমা এরা ঠিক এক বৃন্তে যেন দুইটী ফুল। এমন কি কোন আবশ্যকে একজনকে ডাকিতে গিয়া, সময়ে সময়ে রাণী ফাতেমা দুইটী নামই বলিয়া ফেলিতেন।

হায়! কালের করাল গতি, আজ অকালে তোমাকে সেই বৃন্তচ্যুত করিল, আজ অপ্রস্ফুটিত অবস্থায় তুমি আমা হইতে চিরবিচ্ছিন্ন; কিন্তু আমি যেন এখনও মনে ধারণা করিতে পারিনা যে, ফাতেমা আমার আর ইহ জগতে নাই।

বিবাহের পর পিত্রালয়ে গিয়া একদিন তোমার রচিত কয়েকটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পদ্য দেখিতে পাইয়া, আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তোমার বালিকাবুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছিলাম, "তুমি অতি সুন্দর রচনা করিয়াছ, বই লিখিতে আমারও বড় সাধ হয় কিন্তু অসম্ভব ভাবিয়া সাহসে কুলায় না।" তাহাতে তুমি "অসম্ভব কেন হইবে? চেষ্টা করিলে সকলই সম্ভব হয়। সেজবুবু তুমি চেষ্টা করিয়া দেখ, নিশ্চয়ই বই লিখিতে পারিবে" বলিয়া আমাকে অভয় দিয়াছিলে।

ভগিনী তোমার উপদেশ বা অনুরোধ আমি এক দণ্ডের তরেও ভুলি নাই। প্রভুর নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া, আর তোমার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, খঞ্জের পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন চেষ্টারূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমার এই 'স্বপ্নদৃষ্টা'কে তোমার পবিত্র স্মৃতির কোলে উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

রাণী।

নিবেদন।

প্রাচীন ভদ্রবংশীয় মসলমান, আয়মাদার কন্যা বিধায়ে, এবং কঠিন পর্দ্দাবগুণ্ঠনের খাতিরে আমার সামাজিক ও পার্থিব অভিজ্ঞতা worldly experience খুবই কম। বলিতে কি, পিত্রালয়ে অবস্থান কালে অষ্টম বর্ষ পূর্ণ হইবার পর, চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত অন্দর ও মস্তকোপরি চন্দ্র তারকা খচিত নীল চন্দ্রাতপ ভিন্ন, কোনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নয়ন পথের পথিক হয় নাই।

স্বামীর দেশ পর্য্যটনটা ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা স্বভাবগত হইয়া পড়ায় বিবাহের বৎসর, অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১৩১৯ সাল হইতে আমিও জেলের কোমরের হাঁড়ির ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এদেশ ওদেশ যাইতে আরম্ভ করিলাম। এবং তজ্জন্যই কঠিন strict পর্দ্দা ক্রমশঃ আপনা আপনিই একটু শিথিল ভাবাপন্ন হইয়া আসিল।

এই হইতেই আমার সামান্য অভিজ্ঞতা। এবং এই যৎসামান্য অভিজ্ঞতা মূলেই আমার পুস্তিকা রচনার প্রয়াস বা ঘোর পাগলামি।

জীবনে কখনও পাঠাগারের বেঞ্চে বসার আস্বাদন পাই নাই। কখনও কোন শিক্ষকের নিকট পাঠার্থে বই খুলিয়া বসি নাই। আপন কৌতূহল নিবারণার্থে আপনা আপনি সামান্য ক, খ, ঠ, শিখিয়া দুচারি খানি বই হাতে করিয়াছি মাত্র।

এক্ষেত্রে পুস্তক লেখায় আমার আগাগোড়া ভুল না হওয়াই অসম্ভব জানিয়াও, ও রচনা স্থানে স্থানে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে

বুঝিয়াও দুঃসাহসিকতার শরণাপন্ন হইয়া এই যৎসামান্য উপহার "স্বপ্নদৃষ্টা" হাতে আজ পাঠক-পাঠিকার নিকট উপস্থিত হইতেছি।

পুস্তকপাঠে একজনেরও একটু মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

নূরকুটীর, শ্রীরামপুর,
সন ১৩৩০ সাল, ২রা আশ্বিন। }

নূরন্নেছা।

স্বপ্নদৃষ্টা

প্রথম অংশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

“মুখখানা যে শুকিয়ে এতটুকু হ’য়ে গেছে. আজ আবার নূতন কিছু হ’য়েছে বোধ হয় ? ”

“আমার আবার নূতন পুরাতন আছে, নিত্যি নূতন মধুর বাণী, পারিনে ভাই আর পারিনা। যম রাজা যে একেবারে চোক কানের মাথা খেয়ে ব’সে আছেন। একটা অভাগী, বাণ-বিদ্ধা হরিণীর মত ঘরের কোণে প’ড়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ ক’চ্চে, তা সেদিকে একটু খেয়ালও নাই। বেছে বেছে সুখী যারা, ভাগ্যবতী যারা তাদেরকে তিনি দেখতে পান। বিচার নেই গা, যে আদর ক’চ্চে সর্ব্বক্ষণ তাঁকে ডাকে তার কথা শুনা নেই। দেখা পেলে দশ কথা শুনিয়ে দিতুম। ”

"সে বেচারির দোষ কি? তোমার যতদিন আব দানা বাকি আছে ততদিন তার সাধ্য কি যে তোমার কথা মত কাজ করে।"

"না করলে আমি বিষ খেয়ে ম'র্‌ব।"

"ছিঃ ওসব কথা কি ব'ল্‌তে আছে। বিষ খেয়ে ম'রে শেষে ভূত হয়ে ডালে ডালে বেড়াবে।"

"ভালই হবে, যারা আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে কয়লা ক'চ্চে, ভূত হ'য়ে তাদের ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাব।"

"তওবা, তুমি একেবারে বয়ে গেলে যে! অত উতলা হ'য়ে কোন ফল নেই। সবুর কর, চিরকাল এমন দিন যাবেনা। খোদা একদিন না একদিন তোমাকে সুখী ক'র্‌বেন।"

"সে আশা নেই ভাই। আর জন্মে কত পাপ করেছিলুম, তাই এ জন্মে তার ফল ভোগ ক'চ্চি। হাঁস্‌লে কেন ভাই?"

"এই মনে ভাব্‌চি, পাপ ক'রে ম'রে গিয়ে তার ফলভোগ ক'র্‌বার জন্য আবার ফিরে আসাআসির চেয়ে, দুদিন বেশী ক'রে বেঁচে থেকে ফলটা ভোগ ক'রে গেলে কি বড় অপরাধ হ'ত? এখানে পাপ ক'রে যদি এইখানেই তার শাস্তি হয়ে যে'ত; অর্থাৎ কিনা ম'রে গিয়ে পাপটুকু ক্ষয় কর্‌বার জন্য আবার ফিরেফিত্তে এসে, সেই বোঝাটা এত সহজে নামিয়ে যাওয়া চ'ল্‌ত, তাহ'লে এত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর নরক সৃজনের কোন দরকারই ছিল না।"

"অত শত বুঝিনা ভাই, যা শুনি তাই বলি।"

"তবে আমার স্যাম্নে আর ওকথা ব'লোনা। ঐ আর-জন্ম এ-জন্ম শুন্‌লে আমার বড় রাগ হয়। যাক, অন্য কথা বল। হঠাৎ ভূত

হবার এত ঝোঁক উঠ্‌ল কেন? দেখো ভাই আমার যেন ঘাড় টাড় ভেঙ্গোনা।"

"না ভাই তামাসা নয়, এক এক সময় এমনি ইচ্ছা হয় বটে, শুধু ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমার কথা ভেবে, আর একজনের মুখ চেয়ে আজিও বেঁচে আছি। তুমি হেসোনা ভাই, পোড়া প্রাণের আবার মায়াও একটু হয়।"

"আহা! প্রাণের মায়া কার না আছে? তোমারই বা না থাক্‌বে কেন? দেখ' তোমায় আর কেউ ভাল বাসুক আর নাই বাসুক, যিনি বাস্‌বার তিনিত বাসেন?"

"ভুল বুঝেছ দিদি, তিনি ভাল না বাস্‌লে বরং ভালই হ'তো, তার জন্যই অভাগীর আরো সর্ব্বনাশ হয়। আমার ননদিনী বলে কি—

'জাননা মা, ভোগের আগে পেসাদ। আইবুড়ো কালের পীরিত, একি যা' তা' কথা! হাত বরাবরি ক'রে আম বাগানে বেড়িয়ে, নির্জ্জন পুকুরপাড়ে ব'সে, প্রেমালাপ ক'রে বর পেয়েছে, এখন মা বোনের দখলে আস্‌তে দেবে কেন?'

এ সব ঘেন্নার কথা শুনে প্রাণের মধ্যে কি যন্ত্রণা হয়, বল দেখি ভাই! আমি কি ব্যাভিচারিণী?

"পাড়াগাঁয়ে ভাবসাব থাক্‌লে পাড়ার ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে ব'সে হাসি তামাসা গল্প গুজব ক'রেই থাকে। তাতে কি কোন্ দোষ হয়, না তার মধ্যে মন্দ অভিপ্রায় থাকে?"

"তা নয় তা নয়, তবে কিনা তোমাদের মেয়েরা, লোকমুখেও শুনেছি ও বইতেও পড়েছি, চৌদ্দ বছুরে ষোল বছুরে মেয়েও কুড়ি

বাইশ বছরের ছেলের কাছে ব'সে গান বাজনা শেখে, থিয়েটারে যায়, নৌকা চড়ে বেড়ায়; তাতে তোমাদের সমাজেত কোন দোষ হয় না। কিন্তু যত দোষ দেখ্‌চি তোমার বেলা।"

"কি করি ভাই, বরাত মন্দ, আর গরীব আমরা। বড় লোকের মেয়ে হ'লে, বাপ মা টাকায় গহনায় হাজার পাঁচ সাত দিতে পাল্লে, শত দোষ চাপা প'ড়্‌ত। গরীবের দোষ পদে পদে।

বড় মানুষ যদি শাক ভাত খায়, সেটা হয় সখ ক'রে খাওয়া, আর গরীবের বেলা—বেটার জোটেনা ব'লে। বড় লোকের যুবতী কন্যা বাইশ বছুরে যুবকের কাছে ব'সে নির্জ্জনে গান বাজনা শিক্ষা ক'র্‌লে, তার নাম নিষ্কলঙ্ক বিদ্যা শিক্ষা করা; আর নির্জ্জন স্থান না হ'লে তাদের বেলা শিক্ষাও ভাল হয় না। সমাজের কর্ত্তারা অমনি সায় দিবেন, ঠিক ব'লেছেন মশাই, ও রকম না ক'র্‌লে মেয়েদের ভাল শিক্ষাই হয় না। আর পোড়া গরীবের কিশোরী কন্যা, পাড়ায় খেলার সঙ্গী কিশোর বয়স্ক বালকের সঙ্গে যদি একটু হেসে কথা বলে, তবেই সর্ব্বনাশ!

গঙ্গার ঘাটে নাইতে গিয়ে মেয়ে মহলে অম্‌নি মিটিং ব'সে গেল, অমুকের বাড়ীর মেয়ে অমুক ছোঁড়ার সঙ্গে ব'সে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি ব'ল্‌ছিল। আর হেসেই গড়াগড়ি, ওমা কি ঘেন্না—কি ঘেন্না!

যুবতীর দল অম্‌নি মুচকে হেসে এ ওর গা টেপে, এ ওকে চোক টেপে, আর হেসেই লুটোপুটি।

আর সমাজকর্ত্তারা অম্‌নি চিৎকার ক'রে সুর ধ'র্‌বেন, হারামজাদি বেটীর যে যেখানে আছে, তাদেরকে একঘরে ক'রে তবে অন্য কাজ। এত বড় বজ্জাৎ মেয়ে, পাড়ার ছেলেগুলোকে খারাপ ক'চ্চে। নিকাল

দাও পাজি বেটীকে, আভি নিকাল দো।

নিজেদের কথা নিজেই বলি আমাদের সমাজকর্ত্তারা বড়ই এক চোখো, আর দয়াহীন।"

স্বপ্নদৃষ্টা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাসের দিবা অবসান। দূর হইতে পাপিয়ার মধুময় স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। ধূম্রবর্ণ খণ্ড খণ্ড মেঘ আকাশের গায়ে জমাট বাঁধিয়া, খোদা তায়ালার মহিমা জানাইতেছে। দিবসের শেষে রবির স্বর্ণ জ্যোতির্ময় বিদায় দৃষ্টিতে, মানবের ক্ষুদ্র হৃদয় পুলকে ভরিয়া উঠিতেছে।

সন্ধ্যায় ঊষার খেলা, সমস্তই যেন মোহ, স্বপনে জাগরণে মিশ্রিত হইয়া চির বিস্মৃতির মধ্যে কত মধুর স্মৃতি উথলিয়া উঠিতেছে। দুঃখ বিনাশ করিয়া সুখের কাহিনী প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছে।

সান্ধ্য-ছায়া ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিল; ও ধীরে ধীরে উত্তর পশ্চিম আকাশ প্রান্তে গাঢ় মেঘের সঞ্চার হইল।

এই সময়ে দ্বিতলের রেলিং ঘেরা বিস্তৃত বারাণ্ডায় দুইটী যুবতী বসিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার কথোপকথন করিতেছিল। রমণীদ্বয় সুন্দরী, এবং ভিন্ন জাতীয়া। প্রথমা রমণী মসলমান, খ্যাতনামা উকিল আনওয়ার আলির স্ত্রী।

আনওয়ার আলি বীরভূম জেলার অন্তর্গত, সোনারপুর গ্রামের অতি সমৃদ্ধিশালী ও ধর্ম্মপরায়ণ জমিদার, মৌলুবী মোবারক আলির পুত্র।

স্বপ্নদৃষ্টা

মোবারক আলির দান খয়রাত, ও সদ্‌গুণের সুবিমল যশঃসৌরভে, দেশ বিদেশের আবাল বৃদ্ধ, দীন দুঃখী, তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করিত। তাঁহার সংসারে অনাথা, অন্নক্লিষ্টা, সহায়হীনা অনেক দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া ও অনাত্মীয়া প্রতিপালিত হইত।

তিনি মান ইজ্জৎ বজায় রাখিয়া ষাট বৎসর বয়সে, বংশধর বিদ্বান বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান দুই উপযুক্ত পুত্র, ও এক পুত্রবধূ, এবং দুইটী কন্যা রাখিয়া, তাহাদের স্নেহের দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিয়া কালের ডাকে এক অচেনা রাজ্যে চলিয়া গেলেন।

মোবারক আলি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তিনি ন্যায়পথে থাকিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ দান ধ্যান, পরোপকার এবং ধর্ম্মকার্য্যেই ব্যয় করিয়া যান। এত অধিক সদ্ব্যয় সত্ত্বেও, মৃত্যুকালে প্রচুর আয়ের জমিদারী, প্রকাণ্ড ভদ্রাসন সংলগ্ন বৃহৎ বৃহৎ ফলের বাগান, ও চতুর্দ্দিকে সানের ঘাট বাঁধান যে পাঁচ ছয়টী দীর্ঘিকা বজায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

জ্যেষ্ঠ আনওয়ার আলি পিতৃত্যক্ত জমিদারি, বা এই সমস্ত সম্পত্তির কোন অংশ স্পর্শও করেন নাই। কনিষ্ঠ আফতাব আলি ও ভগ্নীদ্বয়কে দিয়া, নিজে রিক্ত হস্তে খোদার নাম করিয়া বিদেশে বাহির হইয়া পড়েন।

আনওয়ারও পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। করুণাময়ের দয়ায়, ও স্নেহশীল স্বর্গীয় পিতার যত্নে, যে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন; সেই বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে অল্পদিন মধ্যেই, তিনি জেলার মধ্যে খুব ভাল উকিল

খুলিয়া সুবিমল খ্যাতি লাভ করেন।

কিন্তু তাহার এই উন্নতির প্রারম্ভেই অকস্মাৎ দুই দিনের জ্বরে, তাঁহার সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়।

আনওয়ার প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগে সংসার অন্ধকার দেখিলেন। বিশেষতঃ শিশু কন্যাটিকে লইয়া তাঁহার বসন্তময় জীবন হঠাৎ মরুভূমির উষ্ণ বাতাস স্পর্শে তাপ দগ্ধ কদলীপত্রের ন্যায় নুসাড়িয়া পড়িল। সমস্ত হৃদয় প্রাণ যেন অসহনীয় যন্ত্রণায় ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইতে লাগিল।

এই যে সুখ বা দুঃখ, আনন্দ বা যন্ত্রণা; ইহা কয়দণ্ড স্থায়ী! ইহা ভ্রান্ত মানব হৃদয়ের ক্ষণিক দুর্ব্বলতা, শূন্য মায়া মোহ, অবসান দীপ্ত দুই দণ্ডের মরীচিকা মাত্র। কেহ কাহারও নয়।

"তুমি কার কে তোমার, কারে বল রে আপন,
সময়ে পালাবে তারা কে করে বারণ।"

আফতাব আলির বিবাহ হয় নাই। ভগ্নী দুটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা নিজ নিজ শ্বশুরালয়ে বেশ সুখে ঘর-কন্না করিতেছে।

আনওয়ার আলি স্ত্রী বিয়োগের পর বড়ই একা বোধ করিতে লাগিলেন। যদিও কর্ম্ম-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া নিয়মিত সময়ে প্রত্যহ নিজ আফিসে বসিয়া মনস্থির পূর্ব্বক কাজ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে প্রয়াস পাইতেন, তথাচ হাতে কাজ কম থাকিলেই উদাস মনে, অর্থহীন দৃষ্টিতে, আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। আর থাকিয়া থাকিয়া নিরাশার হা হুতাশে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন।

এই কারণেই আনওয়ার কাজ কর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন, ও কার্য্যকেই সঙ্গীহীন জীবনের নূতন সঙ্গী ভাবিয়া আঁকড়িয়া ধরিতেন।

আনওয়ার আলি সাময়িক নমাজান্তে, অনেকক্ষণ ধরিয়া পরম করুণাময় খোদা তায়ালার নিকট দুই হাত তুলিয়া মোনাজাত করিতেন, ও বলিতেন, "হে করুণানিদান আল্লাহ—তায়ালা, তুমি আমাকে শোকে জ্ঞানহারা করিওনা, কর্ত্তব্যে অমনোযোগী ক'রোনা; আমার মনে বল দাও।" আনওয়ার কায়মনে প্রত্যহ করুণাময়ের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতেন।

ভক্তিভরে একাগ্রচিত্তে যে জগৎপিতার নিকট যাহা প্রার্থনা করে, খোদা তাহা কবুল করে। শোকের প্রচণ্ড আঘাতে যে হৃদয়-খানি ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, জীবনে যার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, আনন্দ-ময় সংসার যাহার নিকট এক্ষণে পূতিগন্ধময় নরক বলিয়া বোধ হইতে-ছিল, দুঃসহ চিন্তাভারে শরীর, মন, প্রাণ যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল; বক্ষ পঞ্জর বিদীর্ণ হইয়া, জ্বালাময় তপ্ত শ্বাস বাহির হইতে-ছিল, যাহার বিদ্রোহী মন, এক ফোঁটা সুখের আশায় পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াও, কোথাও সুখের চিহ্ন মাত্র না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিত, যে সুখের সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও শয্যা কণ্টক অপেক্ষা তীক্ষ্ণ তীর বিদ্ধ হইতেছে বোধ করিত; সেই আনওয়ার ক্রমশঃ আজি সর্ব্বশক্তি-মান সর্ব্বশক্তির আধার, পরম করুণাময়ের অনন্ত মহিমায় নবজীবন লাভ করিলেন। পূর্ব্বের অসহ্য শোক তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা, সমস্তই ক্রমশঃ

অতীতের গর্ভে বিলীন হইতে লাগিল।

আনওয়ারের মনের বিশ্বগ্রাসী গভীর অন্ধকার দূরে, বহুদূরে পলায়ন করিতে লাগিল ও ক্রমশঃ তাহার শূন্য স্থান মধুময় স্নিগ্ধ আলোকে পরিপূর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। প্রভু প্রদত্ত সঞ্জীবনী শক্তি লাভে, আনওয়ার আলির চিন্তা-ক্লিষ্ট বিষাদ মাখা মলিন মুখখানি ক্রমে জ্যোতির্ম্ময় ও হর্ষোৎফুল্ল হইতে লাগিল। মরুভূমির তপ্ত বাতাসের পরিবর্ত্তে, বসন্তের সুগন্ধময় শীতল পবন আবার আসিয়া দেখা দিল। পেচকের আশঙ্কা জড়িত তীব্রস্বরের বদলে, কোকিলের মুগ্ধকর সুমিষ্ট স্বর আসিয়া প্রাণে শান্তিবারি ঢালিয়া দিল। ঘোর অমাবস্যার কুজ্ঝটিকাময় জীবন-তরী বিশ্বচালকের ইঙ্গিতে আনন্দ-সাগরাভিমুখে ধাবিত হইল। দয়াময়ের শান্ত প্রলেপে আনওয়ার আলি, নব ভাবপূর্ণ উদ্যমে উৎফুল্ল-চিত্তে, কার্য্যময় সংসার ক্ষেত্রে ঝাঁপ দিলেন; ও প্রাণ খুলিয়া খোদাতায়ালার নিকট প্রেমাশ্রুজলে গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "হে পাক জাত দয়াময়, তোমার কৃপায় আমি নব জীবন পাইয়াছি, আমার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত স্থির হইয়াছে। অহো! খোদা তায়ালা, তোমার মহিমা গুণ গাহিবার ক্ষমতা আমার মত অজ্ঞের ভাষায় আসিতেছে না। তোমার শোকর গোজারি এক মুখে শেষ করা দূরে থাক, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ মুখ হইলেও শেষ করা যায় না। অদ্বিতীয় তুমি, তোমা ছাড়া আর আমার দ্বিতীয় উপাস্য নাই। আমার অন্তরের প্রার্থনা, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে পারি, আমিন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:•:—

ফুলের সুগন্ধে অলিকুল যেমন ছুটিয়া আসে, তেমনি কর্ত্তব্য-পরায়ণ যুবক আনওয়ার আলির নিকট, মানবকুল মক্কেলবেশে ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

দিবা দ্বিপ্রহরে কাছারি বাটী লোকসমাগমে সরগরম। আপন আপন কাজে সকলেই ব্যস্ত। উকিল মোক্তারগণ বড় বড় গলায় বক্তৃতা করিতে ব্যস্ত। মুহুরীগণ দ্রুতহস্তে কলম পিষিতে বা এধার ওধার ছুটাছুটি করিতে ব্যস্ত। আসামী ফরিয়াদীগণ নিজ নিজ সাক্ষী ঠিক করিতে ও তাহাদের মনোরঞ্জনার্থে ভাল সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াইতে ব্যস্ত। আবার সব চেয়ে ব্যস্ত দোকানওয়ালাগণ। কেহ বোম্বাই আমের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে, কেহ বারকোষে তরমুজ কাটা সাজিয়ে, কেহ পাউরুটী [illegible], নান বিস্কুট, মাখন বিস্কুট বলিয়া চীৎকার করিয়া খদ্দেরগণের মন আকৃষ্ট করতে ব্যস্ত। আবার কেহ বাক্সের উপর পান, বিড়ি, সিগারেট ও রকমারি ছবিওয়ালা দিয়াশলাইয়ের বাক্স সাজাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে ডাব কাটিয়া খদ্দের জমা করিতে ব্যস্ত।

অদূরে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের কাণ্ড ঠেসিয়া বসিয়া, পানসে দোষে মাত্র গোটা দুই তিন দাঁত ভাঙ্গা ও রৌদ্র লেগে সামনের সামান্য

গাছ কয়েক চুল পাকা এক যুবতী পানওয়ালী, চতুর্দ্দিকে কেরাসিনের বাক্‌সে ও ডাবা হুকায় বেষ্টিত হ'য়ে, নাকে সটানা নথ ঝুলিয়ে ও পাতা ক'রে চুল বেঁধে, আহলে মামেলগণকে কাছে ডাকিয়া বসাইয়া আপ্যায়িত করিতে ব্যস্ত। আবার মধ্যে মধ্যে, ওরই মধ্যে একটু ফিট্, ফাট্ গোছের বাবু দেখলেই, অতি ব্যস্ত হ'য়ে, চক্‌চকে থাব হুকোটার মাথায় কলিকা সংযোগে ফুঁ দিতে দিতে, তাড়াতাড়ি পরণের মিহি কালাপেড়ে শাড়ীটার আঁচল দিয়ে, নারিকেল মালার অংশটা মুছে, সযত্নেই হউক বা অন্য উদ্দেশ্যেই হউক, একগাছা নূতন তাগা পরা দক্ষিণ হস্তটা বাড়িয়ে ও ঠিক অনন্ত পরার স্থানটা বাম হস্তের ঠেস্ দিয়ে ধ'রে "এই হুকো নিন্ বাবু, আপনার জন্যেই এই সাজ্‌লুম" ব'লে হুকো বাড়িয়ে দিতে ব্যস্ত।

যেমন একজন অপারপাটি কেশ, মলিন বেশধারী পাড়াগেঁয়ে যুবক আসিয়া "মেয়ে এক পয়সার পান দাওনা গা, ক' খিলি দিচ্চ? এক খিলি বেশী দিও গো" বলিল, অমনি পানওয়ালী সজোরে নথ-টানা সমেৎ নাক ঘুরিয়ে নিয়ে "নারে বাপু পান হবেনা, পান নেই" ব'লে তাহাকে আপ্যায়িত করিল। নাছোড়বান্দা যুবক "কেন গা, ঐ ত পান সাজা র'য়েছে" বলার সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক, পক্ক কেশে বাহারে টেড়ি কাটা আমলা বাবু, হন্ হন্ ক'রে এসে ধপাস্ করিয়া একটা কেরাসিন বাক্‌সের উপর বসিয়া পড়িয়া, হুকা লইতে হাত লম্বা করায়, পানওয়ালী তাহাকে হুকা দিতে দিতে "না গো না, ও পান তোমাদের জন্য নয়, এই বাবুদের জন্য সেজে রেখেছি" বলিয়া একটা পান লইয়া আমলা বাবুর হাতে দিলে, পূর্ব্বকথিত লোকটা

স্বপ্নদৃষ্টা

"কেন গা মেয়ে, আমাদের পয়সা কি পয়সা নয় ?" শব্দ যেমন মুখে আনিল, অমনি পানওয়ালি "বেরো মুখপোড়া বুড়ো, ভারি মুখ তার পান খেতে এসেছে, আমার বাবুরা আগে না কোথাকার বুড়ো মিন্সে আগে" ইত্যাদি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল।

লোকটীও ছাড়িবার পাত্র নয় "হ্যাঁ উনি খুকি, আর আমি বুড়ো।" এই আর দেখে কে ! পানওয়ালি কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে "বাবু দেখুন বুড়োমিন্সেটা আমায় গালি দিচ্চে" ব'লে যাকে সামনে পেলে তারই কাছে নালিস ক'ত্তে আরম্ভ ক'র্লে। শেষে একজন মুহুরী বাবু "কি গো পানওয়ালী দিদি কি হ'ল আবার ?" প্রভৃতি মিষ্ট সম্ভাষণে পানওয়ালীকে ঠাণ্ডা করে।

এই সময় আমাদের আনওয়ার আলি সাহেব, একটা হরতালের মকদ্দমায় আসামীর পক্ষে দাঁড়াইয়া, সরকার তরফের সাক্ষিগণকে জেরা করিতেছিলেন। কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর মধ্যে মধ্যে বাধা দিতে উঠায়, ক্রমশঃ উকিল সাহেব অধৈর্য্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। উভয়ে বাগযুদ্ধও বেশ চলিতে লাগিল, বিচারক ডেপুটি বাবু ও পলিটিক্যাল, মোকর্দ্দমা বিধায়ে তদ্বিরের কোন ত্রুটি না হয় দেখিবার জন্য, পার্শ্বে একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট পুলিশ সাহেব, উভয়ে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। একটু পরে ডেপুটি বাবু "আজ এই পর্য্যন্ত থাক, সামনের সপ্তাহে একটা খালি দিন দেখে, দিন ফেলিয়া দিন", বলিয়া নথি পেস্কারের নিকট ফেলিয়া দিয়া, খাষ কামরায় চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য পুলিশ সাহেবটিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ খাষ কামরায় গেলেন।

ক্রমে উকিল সাহেবের কাছারির কায শেষ হইয়া বাসায় ফিরিবার

সময় উপস্থিত হইল।

এদিকে দিনমণিও সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর, কোর্টে নানা রকমের স্বার্থপর লোকগুলোর নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য, ন্যায়কে অন্যায় করিবার অভিলাষে এবং বিচারকের চক্ষে ধূলা মুষ্টি নিক্ষেপ করিবার কত উপায় উদ্ভাবন করিতেছে দেখিয়া, মুখ মুচ্‌কিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া এবং ন্যায় অন্যায়, সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, সত্য মিথ্যা, জয় পরাজয়, ভূত ভবিষ্যৎ সকলকে উপেক্ষা করিয়া, প্রভুর ইঙ্গিতে অনুগত ভৃত্যের ন্যায়, স্বর্ণজ্যোতি ছড়াইতে ছড়াইতে পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়া ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান হইলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই নীল ও লাল সূতায় বোনা ময়ূরকণ্ঠি শাড়ী পরিয়া, নীল রঙ্গের চতুর্দ্দোলা আরোহণে, ভাব বিভোর হৃদয়ে সন্ধ্যাবধূ আসিয়া দেখা দিলেন। তাল ও নারিকেল বৃক্ষগুলি, দেবদূত সৈন্যশ্রেণীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পক্ষিগণ দলবদ্ধ হইয়া সমস্বরে মধুরকণ্ঠে, জগৎপাতার মহিমা-গীতি গাহিতে গাহিতে, সন্ধ্যা দেবীর অভ্যর্থনার জন্য ছুটিয়া চলিল। চাঁদ আনন্দে অধীর হইয়া, নববধূর সৌন্দর্য্যভরা মুখখানি দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, প্রহরী তালবৃক্ষগণের ফাঁক দিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং নববধূ রজনীর বিলম্বে, আগমন প্রতীক্ষায়, অভিমানে এক একবার মেঘের কোলে মুখ লুকাইয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। তারাগুলি অবাধ্য বালিকাদলের ন্যায় পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া প্রত্যেকেই আগে যাইবার চেষ্টা করিতেছে। আবার গুরু গঞ্জনার ভয়ে ছুটিয়া পালাইতেছে। কখনও বা একটু মেঘের ঝোপ ঝাপ পাইলে তাহার আড়ালে গিয়া লুকাইতেছে।

স্বপ্নদ্রষ্টা

কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া, আনওয়ার আলি খোলা ছাদের উপর আরাম কেদারায় অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায়, আকাশ পানে চাহিয়া ঐ পবিত্র মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া "সোবহান আল্লাহ, বিশ্ব-কারিকর তোমার কারিগিরী কি সুন্দর" বলিয়া উঠিলেন।

"কে সুন্দর, কোন্ সুন্দরীর ধ্যান হ'চ্চে" বলিয়া পশ্চাৎ হইতে একজন যুবক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"আরে তুমি, ভাল আছ; কখন এলে, বাড়িতে সব ভালত?"

আগন্তুক—"এক সঙ্গে অতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিবার ক্ষমতা আমার নাই—"

আনওয়ার—"না থাকে জিরিয়ে সাঁতিয়ে, এক একটা ক'রে দাও।"

আগ—"তা দিচ্ছি, আগে তুমি কোন্ সুন্দরীর পাল্লায় প'ড়েছ তা বল।"

"দেখ্‌তে চাও, না শুন্‌তে চাও?"

"দেখ্‌তে পেলে কেউ কি শুন্‌তে চায়?"

"তবে ঐ দেখ" বলিয়া আনওয়ার আলি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আগন্তুককে, হীরকখচিত সান্ধ্য-আকাশের দিকে দেখাইয়া দিলেন।

যুবক ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার হর্ষোৎফুল্ল বদনমণ্ডল প্রগাঢ় আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সাগ্রহে অথচ প্রশান্তকণ্ঠে বলিলেন, "এ সুন্দর হইতেও সুন্দর মধুর দৃশ্য সারা জীবন দেখিলেও সাধ মেটেনা। যার সৃষ্টি এতাধিক নির্ম্মল সুন্দর, না জানি সে নিজে কত অধিক সুন্দর

মূর্খ আমরা, সামান্য আমরা, কি ক'রে বু'লব কত সুন্দর তিনি,

তাঁর কৌশলময় কার্য্য দেখে, তাঁর সৌন্দর্য্যময় সৃষ্টি দেখে, প্রাণে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা মুখ ফুটে ব'ল্‌বার ক্ষমতা আমাদের ক্ষুদ্র মানবের কোথায়।

"হাঁ একটা কথা বলি, তুমি বে ক'চ্ছনা কেন?"

"বে না করায়, কোন অপরাধ আছে কি?"

"আছে বই কি।"

"সে কি অপরাধ?"

"এমন কিছু নয়, তবে কিনা শীতের পরই বসন্তের আবির্ভাব হয়, অতিরিক্ত গ্রীষ্মের পর বর্ষা আরম্ভ হয়—"

"তাত' হ'য়ে থাকে, তাই ব'লে হিমাচলের চির-তুষারাবৃত শৃঙ্গের ন্যায় দেহ যার ঠাণ্ডা, তার কাছে বসন্ত ঘেঁস্‌তেই পারে না।"

আগন্তুক সহাস্যে "তাই নাকি? গায়ে হাত দিয়ে দেখি?"

"গায়ে হাত দিয়ে দেখ্‌লে কি টের পাবে, মনে হাত দেবার উপায় থাকে ত, হাত দিয়ে দেখ।"

আগন্তুক নাকের নিকট হাত লইয়া গিয়া "এই ত বেশ গরম শ্বাস; হিমালয় দূরের কথা, এ যেন মরুভূমি হইতে সাইমুন বাতাস আসিয়া গায়ে লাগিল। তামাসা নয় ভাই, সত্য ব'ল্‌ছি, বে ক'রে সংসারী হও, দেখতেও ভাল শুন্‌তেও ভাল। শুধু শুধু একা বিছানায় প'ড়ে সারা রাত্রিটা কড়িকাঠ গোণা কি ভাল দেখায়? ওহঃ! অন্ধকার হ'য়ে এলো, আজ এই পর্য্যন্ত, তবে আসি ভাই, গুড্‌ নাইট্‌।"

বলিয়াই আগন্তুক সজোরে উকিল সাহেবের দক্ষিণ কর-মর্দ্দন করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

এই আগন্তুক যুবক পুলিশের একজন নূতন ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, নাম শ্রীমান সচ্চিদানন্দ গোস্বামী। ইঁহাকে আমরা ভবিষ্যতে সচি বাবু বলিয়া উল্লেখ করিব। এই সচি বাবুর স্ত্রীই আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিতা আনওয়ারের স্ত্রীর সখী শ্রীমতী বীণা-পাণি দেবী।

আনওয়ার আলি, বন্ধু চলিয়া যাইবার পর ছাদ হইতে উঠিয়া নিজ শয়ন কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন, তৎপরে অজু করিয়া, এসার নমাজ পড়িয়া, আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভের পর, এটা ওটা ভাবিতে ভাবিতে শয্যায় গা ঢালিয়া দিলেন। হঠাৎ কড়ি বরগার দিকে দৃষ্টি পড়ায়, পুলিশ বন্ধুটীর কথাটী মনে পড়িল, ও হাসির সহিত তাহার সত্যতা অনুভব করিতে লাগিলেন। শেষে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া তাঁহার স্বর্গীয়া স্ত্রীর বিষয়, এবং স্ত্রী বিয়োগের পর পুনরায় দার-পরিগ্রহ করা বিধেয় কি না, ও করিতে হইলে যে সমস্ত পুঞ্জীকৃত বিবাহ সম্বন্ধ আসিতেছে, তাহার মধ্যে কোন্‌টীতে মত দেওয়া কর্ত্তব্য; এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে, নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে শায়িত হইলেন।

সেই রাত্রে পর্য্যঙ্কের উপরিস্থ সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত থাকিয়া গাঢ় নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিলেন—

তাঁহার মৃতা স্ত্রী সুনির্ম্মল শুভ্র বসন পরিধানে, একটী লজ্জাবিনম্র-বদনা, পরমা সুন্দরী কিশোরীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আসিয়া দণ্ডায়মানা। তিনি কিশোরীর পরিচয় জিজ্ঞাসার্থে তাঁহার স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করিবা-মাত্র, মৃতা তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, পার্শ্ববর্ত্তিনীর চিবুকস্পর্শে

তাহার নত মুখটী ঈষৎ উন্নত করিয়া ধরিলেন ও বলিলেন,—

"দেখ দেখি, মুখখানা পছন্দ হয়? এটি আমার ছোট বোন। একে তুমি বিবাহ করিও, সুখী হইবে।" এই বলিয়াই মৃতা, সঙ্গিনীর সহিত অদৃশ্য হইলেন।

আনওয়ার আলি নিদ্রাবশে "শোন, শোন" বলিয়া ডাকিতেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ধড় মড়িয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবলমাত্র মেঝেয় রক্ষিত হারিকেনটির মিটমিটে আলো ব্যতীত, ঘরের মধ্যে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। চোখ মুছিয়া ভাল করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন, কোথাও কিছুই নাই।

তখন একে একে স্বপ্ন-ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত আনওয়ারের মনে জাগিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মৃতা স্ত্রীর বোন উপাধিত বালিকার লজ্জা-বনত সুকোমল অনিন্দ্যাসুন্দর ঢলঢলে মুখখানি, হৃদয়-ক্যামেরা অভ্যন্তরস্থিত মানস-প্লেটে অঙ্কিত হইয়া গেল।

আনওয়ার প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই স্বপ্নরাজ্যের রাণী না পাইলে, আর কাহাকেও হৃদয়ে ধারণ করিবেন না।

তারপর কত ধনী মানীর সুন্দরী মেয়ের সম্বন্ধ লইয়া, তাহাদের আত্মীয় বা বন্ধুগণ আনওয়ারের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিল; কিন্তু স্বপ্নমুগ্ধ আনওয়ারের মন কিছুতেই টলাইতে পারিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আজ রবিবার, উকিল সাহেবের কাছারি বন্ধ। আবার উল্টা রথের বন্ধটাও রবিবারে পড়িয়া যাওয়ায়, আমলা মহলে একটা দিন বন্ধ মারা গেল বলিয়া বড়ই খুঁৎখুতুনি। কিন্তু ব্যবহারজীবিগণের ইহাতে বরং আনন্দ।

রথের মেলায় খুব ধুম হয় বলিয়া, কনিষ্ঠ আফতাব আলি মেলা দেখিবার ছলে দেশ হইতে আসিয়াছেন।

আফতাব রথতলায়, রথের টান ও মেলা দেখিতে যাইবেন বলিয়া, আজ একটু সকাল সকালই বৈকালিক নাস্তার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

আবদুল খানসামা একটা রোপাময় ট্রের উপর, কয়েকখানি প্লেটে সাজান, কোনটাতে ছোট ছোট মোটা খাস্তা পারাটা, কোনটাতে মেওয়াদার মস্কাট হালওয়া; কোন বাটিতে রসগোল্লা এবং তিনখানি সুদৃশ্য পোর্সিলনের পিরিচে সুবাসিত ফিরণী লইয়া, টিপয়ের উপর দস্তরখান বিছাইয়া তাহাতে রাখিয়া গেল।

আফতাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিয়া আহারে বসিলেন। এমন সময় দুহাতে দুইটী সুপক্ক নেংড়া আম লইয়া, ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজা মলের শব্দে নিজ আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে আনওয়ার আলির কন্যা আয়েষা, দুঃখীর মার হাত ধরিয়া বক্ বক্ করিতে করিতে

আসিয়া উপস্থিত হইল।

আনওয়ার আলি কন্যাকে নিকটে টানিয়া লইয়া তাহার ক্ষুদ্র কপাল হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ কেশরাশি সরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "একটা আম আমায় দেবে মা ?"

কন্যা আদরের হাসি হাসিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আপনিকে একা দোব না ; চাচাকে দুন্দু দোব। এক্‌তা আপনিকে আল্ এক্‌তা চাচাকে।"

আফতাব আলি সস্নেহে বলিল "দুটোই আমাদিগকে দিয়ে দেবে, তবে তুমি কি খাবে ?"

খুকি হাসিতে হাসিতে চাচার মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া, কচি মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আপনি জানেন না, আপনির মনে থাকে না ? ছেই যে ছেদিন দু ঝুলি আম আন্‌লেন, তা ছব্ বুজি ফুলিয়ে গেল ?"

আফতাব বলিলেন "তাই নাকি, সে আম এখনও আছে ? আমি মনে ক'রেছি অনেক দিন হ'য়ে গেল, আম বুঝি আর নেই।"

খুকি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল "অনেক দিন নয়গো এই চাল্ দিন।"

উভয় ভ্রাতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

দুঃখীর মা বলিল "বাবা তোমাদের মেয়ে পাকা হিসেবী হ'য়ে উঠেচ, এইবার মেয়ের বের জোগাড় দেখ্‌তে হবে।"

আনওয়ার দুঃখীর মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আয়েষা কিছু খেয়েছে ?"

দুঃখীর মা বলিল "না বাপ্‌জি, আমার কাছে আজ ওর খেতে ভাল লাগলোনা, তাই চাচার সঙ্গে খাব ব'লে পালিয়ে আসা হ'ল।"

আফতাব বলিলেন "বটে, তা এতক্ষণ বল্‌তে হয়, এস মা তুমি আমার সঙ্গে খাবে এস।"

আফতাব আয়েষাকে কোলের উপর তুলিয়া লইলেন, চাচার কোলে বসিয়া খুকি আনন্দ সহকারে একবার পারাটায়, একবার হাল-ওয়ায় হাত দিয়া, আবার একটা রসগোল্লা হাতে ক'রে নিয়ে, টেবিলের উপর বল খেলিতে লাগিল।

অবস্থা দেখিয়া দুঃখীর মা বলিল "বুবু জানি এইবার আমি যাই, তুমি খাওয়া হ'লে আমার কাছে যেও।"

আয়েষা অমনি তাড়াতাড়ি হাতের রসগোল্লাটি টেবিল পোষের উপর রাখিয়া, উহাতেই হাত মুছিয়া "দাদাও না গো, তাদা-তাদি ক'চ্চ কেন? আমি তোমাল্‌ ছঙ্গে যাব যে" বলিয়া আফতাব আলির কোল হইতে নামিয়া দুঃখীর মার কোলে গিয়া উঠিল। দুঃখীর মাও তাহাকে কোলে লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

আফতাব আলি চলিয়া যাইবার পর, আনওয়ার বারাণ্ডায় এক-খানি ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার সম্মুখে রাস্তা দিয়া নানা রকমের নানা জাতীয় নরনারী বিভিন্ন বেশ ভূষায় সজ্জিত হ'য়ে, পুণ্যের নামে পাপ সঞ্চয় করিতে চলিয়াছে।

রাস্তার লোকের ভিড় পিপিলীকা শ্রেণীবৎ চলিতেছে। তৎসঙ্গে একটা ভিন্‌ ভিন্‌ শব্দ আসিয়া, আনওয়ার আলিকে অন্যমনস্ক করিয়া

তুলিল। কোন মতেই পুস্তকে মনস্থির করিতে না পারিয়া, আনওয়ার কিয়ংক্ষণ রাস্তার দিকে দেখিতে লাগিলেন।

এই সময় রথে যাইবার পালা ক্রমশঃ শেষ হইয়া এখন বাড়ী ফিরিবার পালা আরম্ভ হইয়াছে। কুলো, ধুচুনী, ধামা ও টোকা, স্ত্রী-লোক গুলোরই হাতে বেশীর ভাগ। আর অধিকাংশ পুরুষের হাতে হুইলের ছিপ, ফুলের চারা, তালবৃন্ত বা পাখীর খাঁচা। আবার ওরি মধ্যে হীন অবস্থাপন্ন বা নিম্নশ্রেণীর পুরুষগুলির কাহারও স্কন্ধে, কাহারও মাথায় বালাগুার মাতুর গুড়ান, টিনের পেটরা বা খেলো কাঠের রথো সিন্দুক। হয়ত বা কাহার মাথায় দুটো মস্ত মস্ত আম কাঠের কেটোর ভিতর, একটা কড়া উপুড় করা ও তাহারই পার্শ্বে খুন্তি ও বেড়ি সাজান র'য়েছে।

বালক বালিকারা মায়ের কাপড ধ'রে, বা বাবার হাত ধ'রে লাফাইতে লাফাইতে ছুটিতেছে; তাদের মধ্যেও কাহার হস্তে মাটির পুতুল, মাটির জগন্নাথ, কাহারও মুখে রবারের ফোলা বাঁশী, যেমনটি মুখ থেকে বাহির হইল অমনি পোঁ-ওঁ-ওঁ সুর ধরিল। দুই একটি ছেলে আবার এক পয়সানে মুখোস কিনে, সেইটিই মাথায় নিয়ে টুপি প'রবার সাধ মিটিয়ে নিচ্চে ও মহা উল্লাসে চ'লেছে।

হাসি ও বাঁশীর ধ্বনিতে সমস্ত রাস্তা মুখরিত করিয়া, রথযাত্রিগণ আনন্দ কোলাহলের সহিত বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে।

মধ্যে মধ্যে কেকালার ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, তদুপরি আজানু লম্বিত পাতলা চুড়িদার পাঞ্জাবি গায়ে, অস্থির দৃষ্টি যুবকের দলও উদ্দেশ্যবিহীন গতিতে অগ্রসর হইতে দেখা যাইতেছে। তাহাদের

দৃষ্টি প্রায় সকল সময়েই যুবতী স্ত্রীলোক যাত্রিগণের দিকে আকৃষ্ট।

এক এক সময়ে অসহ্য হওয়ায়, স্ত্রীলোকগণের মধ্যবর্ত্তিনী প্রবীণার মুখে সুমিষ্ট "বেহায়া মিন্‌সেদের আক্কেল দেখ'না, ওদের ঘরে কি মা, বোন নেই" ইত্যাদি মধুর বচন শুনিয়া, যেন বাবুদের আরও আনন্দ হ'চ্চে, ও আনন্দে হাসির সহিত এ ওর গায়ে গড়িয়ে প'ড়্‌ছে।

খাবারওয়ালা ও অন্যান্য ফেরিওয়ালারা এক বিকট বেসুরে চীৎকার-ধ্বনি তুলিয়া, নিজের গলা ও অপরের কান ফাটিয়ে ফেল্‌ছে।

আনওয়ার আলির এই সমস্ত দৃশ্য ভাল না লাগায়, তিনি আবার পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। হঠাৎ একটা বিজাতীয় বিকৃত কণ্ঠের চীৎকার উত্থিত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একদল মাতাল যুবক, ঘৃণিত অট্টহাস্য করিতে করিতে, বিপরীত দিক হইতে আসিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক কয়েকজন ভদ্রবেশধারি মহিলার গায়ের উপর পড়িয়া, কেহ কাহারও গলায় হাত দিতেছে ও কেহ তদপেক্ষা অভদ্রোচিত কার্য্যে রত।

নিকটে একজন লাল-পাগড়ি-ধারী, আলোক-স্তম্ভের গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে মাত্র। মাতালদের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

মাতালেরা আবার পূর্ব্ববৎ চীৎকার করিতে করিতে, সম্ভবতঃ শীকার অন্বেষণে অন্যত্র চলিয়া গেল। কনষ্টবল প্রভু সেই একই ভাবে দণ্ডায়মান আছেন।

আর সেই বা কি ক'র্‌তে পারে, অতগুলি গুণ্ডার মধ্যে সে একা, বেচারা মার খেয়ে ম'র্‌বে বইত' নয়।

অবস্থা দেখিয়া ক্রোধে ও ঘৃণায় আনওয়ার আলির চোখ মুখ লাল

হইয়া উঠিল। ভাবিলেন কি দুঃসাহসিক নির্লজ্জ এই হিন্দু রমণীগণ আর তাহাদের পুরুষগণ।

শত ধিক্ তাহাদিগকে যাহারা জানিয়া শুনিয়াও এই কলুষিত লোলুপ দৃষ্টির মাঝে, তাহাদের যুবতী স্ত্রী কন্যাগণকে পূণ্য সঞ্চয়ার্থে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহারা কি একবার চিন্তাও করে নাই যে, এই পূণ্যের মধ্যে কত রকমের পাপ উঁকি মারিতেছে?

ছিঃ, আমার জাতীয় যুবতীগণকে এইরূপ ভাবে এই স্থানে দেখিলে, আমি নিজে চাবুক মারিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতাম। ইহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, ইহাদের মাংস শৃগাল কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করাইলে, তবে প্রাণে শান্তি হয়।

আনওয়ার ক্রোধে অধীর হইয়া কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া, বইখানি দূরে নিঃক্ষেপ কারিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—o—

মধুর সুরে সুমধুর প্রাভাতিক উপাসনার আহ্বান – "আল্লাহ আকবার্, আল্লাহ আকবার্" উচ্চারণ শুনিতেই আনওয়ার আলির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলেন, প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোক খড়-খড়ির ফাঁক দিয়া উঁকি মারিতেছে। তিনি তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেই, গন্ধ-চোর সমীরণ বকুলের চুরি করা মিষ্ট গন্ধ আনিয়া, তাঁহাকে উপহার দিয়া গেল।

আনওয়ার তাড়াতাড়ি অজু করিয়া ফজরের নামাজ পড়িলেন, পরে পবিত্রবাণী কোর-আন পাঠ করিয়া খোদায় পাকের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে দয়াময়, আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহা যেন বাস্তব হয়।"

সংকল্প সাফল্যের নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে খোদা তায়ালার কাছে পুনঃপুনঃ মোনাজাত করিয়া, জায়নমাজ উঠাইয়া নীচে নামিয়া নিজের সযত্ন রচিত ক্ষুদ্র ফুলবাগানে আসিলেন। পাইচারি করিতে করিতে দুইটি সদ্য ফোটা গোলাপ ফুলের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। মুগ্ধ নেত্রে উহাদের স্নাবমল শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, ভূত ভবিষ্যৎ কত কথা, কত চিন্তা মনে উদয় হইতে লাগিল।

স্বপ্নদৃষ্টা

আশা ও নৈরাশ্য একাধারে দু'য়ে মিলে, আনওয়ার আলির মুখের ভাব মেঘের কোলে সৌদামিনীর খেলার ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছিল।

আশা বলিল, ভাবনা কিসের, তোমার কি একা গিয়াছে? অমন কত শত লোকের চ'লে যায়, আবার তার চেয়ে অনেক ভাল আসে; তোমারই বা আসিবে না কেন!

নৈরাশ্য চোখ রাঙ্গিয়ে ধমক দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—মিথ্যা সম্পূর্ণ মিথ্যা, এত বড় অন্যায় কথা তুমি কি ক'রে ব'ল্‌ছ! যেমন যায় তেমনটি আর কখনই হয় না। যে রূপ যায় তার চেয়ে ভাল আনাত' দূরের কথা, সেই মত আনাও দুষ্কর। সুন্দরীর স্থানে কুৎসিতা, গুণীর পরিবর্ত্তে নির্গুণ, ভাগ্যবতীর পরিবর্ত্তে অভাগা, বুদ্ধিমতীর বদলে নির্ব্বোধ, এই রকম ভালোর জায়গা খারাপই এসে দখল করে।

আশা স্নিগ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল ভুল, ভুল, তোমার সমস্ত কথাই ভুল; পাগলের প্রলাপ মাত্র। পরমেশ্বরে তোমার বিশ্বাস আছে? বোধ হয়, না, তা না হ'লে, অমন অনাসৃষ্টি কথা ব'ল্‌তে সাহস ক'র্‌তে না।

বিশ্বমালেক যিনি, তাঁর কাছে অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই। আর, অসম্ভব সম্ভব হইতেই বা কতক্ষণ! সে বাদসাকে ফকির করে, আবার ফকিরকে সিংহাসনে বসায়। সাগরকে মরুভূমি ক'র্‌তে ও মরুভূমিকে সাগরে পরিণত ক'র্ত্তে তার সময়ের আবশ্যক হয় না। দুদিনে জাপানকে উন্নতির চরম সীমায় উঠাইয়া, দু দণ্ডে তাহাকে লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিল। আবার সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিসংঙ্ঘ কর্ত্তৃক পদদলিত, চিররুগ্ন Sickman, পতিত তুর্কির প্রাণে প্রকৃত স্বাধীনতার

উজ্জ্বল আলোক নূতন করিয়া জ্বালিয়া, পতন হইতে তাহাকে উত্থানের পথে অগ্রসর করাইল। তাঁহার ক্ষমতা আমাদের ধারণার বহির্ভূত ও তাঁহার উদ্দেশ্য আমাদের বিবেক শক্তির পরপারে।

এইরূপে আশা ও নৈরাশ্যে অনেক বাদ প্রতিবাদ হওয়ার পর, শেষে আশারই জয় হইল। আনওয়ার মনে মনে বলিলেন, আশা তুমিই ঠিক বলিয়াছ, আমি স্বপ্নে যাহাকে দেখিয়াছি, পরমকরুণাময়ের কৃপায় তাহাকেই পত্নীরূপে পাইলে সুখী হইব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ স্বপ্ন কুমারী আল্লাহ তায়ালারই প্রেরিত।

এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত মনে ভাঙ্গা গড়া, ও তৎসঙ্গে শান্তির কল্পনা করিতে আনওয়ার আলির বোধ হয় খুবই ভাল লাগিতেছিল। কিন্তু ভৃত্য জাফর তাহাতে বাদ সাধিল. সে হঠাৎ সেইস্থানে আসিয়া "বাবু আপ্‌কা চা তৈয়ার হ্যায়, পিনেকা বেলা হো গোয়া" বলায়, আনওয়ার চম্‌কিয়া মুখ ফিরাইলেন; এবং ভৃত্যকে একটু কড়া সুরে "হাম্‌কো আগে বোলানে সাকা নেহি কাহে ?" বলিতে বলিতে উপরতলায় উঠিয়া গেলেন।

জাফর চায়ের সরঞ্জাম পূর্ব্বেই যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া মনিবকে ডাকিতে গিয়াছিল। কনিষ্ঠ আকতাব আলি সম্মুখে চা রাখিয়া জ্যেষ্ঠের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

উভয় ভ্রাতা একটি সুন্দর কারুকার্য্য খচিত মেহগিনি কাষ্ঠের ক্ষুদ্র টিপয়ের দুই দিকে দুইখানি হাতা বিহীন বেন্ট উড চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া চায়ের সদ্গতি করিতে আরম্ভ করিলেন। •

আনওয়ার আলি সামান্য চা পান ভিন্ন খাবার গুলিতে আদৌ

হস্তার্পণ না করিয়া, কেবল আফতাবকে বারে বারে অন্যমনস্ক ভাবে "বেশ ভাল ক'রে খাও না" বলায় ; কনিষ্ঠ বলিয়া উঠিলেন "দুঃখীর মা আজ পারাটাটা, খুব খাস্তা ক'রেছে দেখ্‌চি. হালওয়াও বেশ মজাদার হ'য়েছে, আপনি না হয় নিমবেরেস্ত ডিমটা না খেয়ে, হালওয়া দিয়ে পারাটাটি খান।"

"আমায় না দিয়ে একা একা খেলে পেট ফুল্‌বে" বলিতে বলিতে একজন সৌম্যমূর্ত্তি যুবক দৃঢ়পদাবক্ষেপে সিঁড়ির উপর হইতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আগন্তুককে দেখিয়াই. আনওয়ার আলি "আসুন, আসুন ভাই. ওহ! ডাক্তার সাহেব যে ; ভাল ত', অনেক দিনের পর দেখা, আজ আমাদের সুপ্রভাত দেখ্‌চি।" বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

ইত্যবসরে আগন্তুকও জাফরের হাত হইতে নিজের ব্যাগটি লইয়া, উক্ত ব্যাগ ও ছাড়গাছটি খাটের উপর রাখিয়া, হড় হড় ক'রে একখানা নিকটবর্ত্তী চেয়ার টানিয়া, তাহাতে উপবেশন করিতে করিতে বলিলেন "আমি অনেক দেশ বেড়িয়ে এসেছি, আমাকে অত আহম্মক ভেবোনা, যে গরম গরম চা ও খাবার সামে ফেলে রেখে, তোমাদের সঙ্গে বক্ বক্ ক'র্‌ব, আর সেই অবসরে তোমরা দু'ভাইয়ে সব সাবাড় ক'রে ফেল্‌বে।" তাঁহার বলার সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতের কাজ আরম্ভ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আগন্তুক যুবকের পরিচয় এই স্থানে একটু দেওয়া আবশ্যক ইনি আনওয়ার আলির সম্পর্কে মামাত ভাই ইঁহার পিতা হুগলী জেলার মধ্যে পাণ্ডুয়া অঞ্চলের একজন মধ্যবিৎ জমিদার। একমাত্র পুত্রকে মানুষের মত করিয়া তুলিবার ইচ্ছায় পিতা হাজি মহম্মদহোছেন, পানির ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া, পুত্র আহম্মদহোছেনকে ডাক্তারি শিক্ষার্থে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন।

হাজি সাহেবের সম্পত্তির আয় বাৎসরিক সর্ব্ব রকম খরচ বাদে অন্যূন বিশ হাজার টাকা ছিল।

আহম্মদ হোছেন পাঁচ বৎসর বিলাতে থাকিয়া পারদর্শীতার সহিত ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেলজীয়াম, ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য সমূহ পরিদর্শন পূর্ব্বক, ফিরিবার সময় স্বাধীন এস্‌লাম রাজ্য কনষ্টান্টিনোপলে পক্ষাধিক কাল অবস্থান করিয়া পিতার নিকট চলিয়া আসিলেন।

বিদ্যুৎবার্ত্তার সাহায্যে, পূর্ব্বাহ্নে স্নেহের একমাত্র তনয়ের সঠিক আগমন সংবাদ প্রাপ্তে, হাজি সাহেব ঔৎসুক্য প্রাবল্যে পুত্রের আশু দর্শন কমনায়, বর্দ্ধমান ষ্টেশন পর্য্যন্ত অগ্রবর্ত্তি হইয়া বম্বে মেলের প্রতীক্ষায়

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে যে হাজি সাহেবকে কতবার রেলের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারি হইতে সামান্য পয়েন্টম্যানকে পর্য্যন্ত, "আর মেলের কত দেরি?" জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

ডাক্তার আহম্মদ হোছেন ট্রেন অভ্যন্তর হইতে, পিতৃদর্শনে উৎফুল্ল চিত্তে প্লাটফরমে নামিয়াই, প্রথমে পিতার চরণ বন্দনা করিলেন ও পরবর্ত্তী লোকাল ট্রেনে পিতাপুত্রে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কালের সাংসারিক কথা, দেশ বিদেশের-কথা প্রভৃতি নানা একথা সেকথা কয়েকদিন ধরিয়া চলিতে লাগিল।

অবকাশ মত ডাক্তার সাহেব, পিতার অভিমত জ্ঞাতার্থে পিতৃ-সন্নিধানে একদিন নিবেদন করিলেন "বাবাজান আমাকে এখন কি করিতে বলেন? সরকার বাহাদুর আমাকে পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের অধীন সরকারি চাকুরীতে নিযুক্ত করিবার জন্য, আপাততঃ মাসিক ছয় শত টাকা বেতনের প্রলোভন দেখাইয়াছেন। আপনার আদেশ ভিন্ন আমি ঐ পত্রের উত্তর দিতে পারিতেছি না।"

তদুত্তরে পিতা বলিয়াছিলেন "বৎস, তোমাকে বিলাত পাঠাইবার পূর্ব্ব হইতে, আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, আমার বংশে কেহ ডাক্তার হইলে আমি আমার জমিদারির মধ্যে একটা ভাল মত দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ও তাহাতে আমার উক্ত সন্তানকে ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নিঃস্বার্থ ব্যবস্থা ও ঔষধ দানে গরীব দুঃখীগণের উপকার করিব। বাবা, তুমি আমার একমাত্র সন্তান। পরম করুণাময় খোদা তায়ালার কৃপায় আমার সচ্ছলরূপে

সংসার চলিবার পক্ষে যথেষ্ট আয় আছে। অনর্থক পরের দাসবৃত্তি করিবার তোমার কোনই আবশ্যকতা দেখি না। এই যে সেটেলমেণ্ট হইতেছে ইহাতে আমাদের জমিদারীর আয় অন্ততঃ দেড় গুণ বৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব আমার অনুরোধ, যে তুমি আমাকে আমার চির বাঞ্ছনীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন কল্পনা সম্বন্ধে সাহায্য করিয়া দেশের মঙ্গল ও পিতৃপুরুষের নামোজ্জ্বল কর।"

"আপনার আদেশ শিরোধার্য্য" বলিয়া আহম্মদ হোছেন স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। পিতাও আহ্লাদিত মনে পুত্রকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

অতঃপর আহম্মদ হোছেনকে আমরা ডাক্তার সাহেব বলিতে থাকিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—— :o: ——

পিতাপুত্রে উপরোক্ত কথাবার্ত্তার পর প্রায় এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। হাজি সাহেব ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় লোক পাঠাইয়া, অনেক ভদ্র মসলমান পল্লীতে অনুসন্ধান করিতে করিতে শেষে, মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন নওয়াবপুর গ্রামস্থিত খ্যাতনামা আয়মাদার হাফেজ ফজলর রহমাণ সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা মোমেনা খাতুনের অসাধারণ রূপ ও গুণের পক্ষপাতি হইয়া, তাহার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিলেন।

আনওয়ার আলি ডাক্তার সাহেব অপেক্ষা ৩।৪ বৎসরের বড় হইলেও, দুইজনে সমবয়স্ক বন্ধুর ন্যায় প্রাণ খুলিয়া হাসিতামাসা ও গল্পগুজব করিতেন; এবং আবশ্যকমত গম্ভীর ভাবে মুরুব্বিআনা যুক্তি তর্কও করিতেন। ফলকথা, এখনই ছোট বড় ভাই, আবার তদণ্ডেই সমবয়স্ক অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই রকম উভয় সাজে দুটীকে মানাত' ভাল।

ভাল কথা, আসল কথা ছাড়িয়া আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। ডাক্তার সাহেব এক পেয়ালা চা নিঃশেষ করিয়া, আর এক পেয়ালা হস্তে লইয়া এবং তাহাতে একটীমাত্র চুমুক দিয়া পেয়ালা

হস্তে আনওয়ার আলির উদ্দেশে বলিলেন, "তোমার মনের ভাবটা কি, আমায় খুলে বল দেখি ?"

"এতে ভাব সাব মোটেই নাই, আমি এখন বিয়ে টিয়ে ক'র্‌বো না।"

"টিয়ে তোমাকে কেউ ক'র্ত্তে বলেনি বা ব'ল্‌বেনা, বিয়ে ক'র্‌বে না কেন, তাই বল ?"

"সেকথা ব'ল্‌বার নয়, বা শুনবারও নয়, শুন্‌লে আপনি হাস্‌বেন।"

"না মোটেই হাস্‌ব না, আমার হাসি এত সস্তা নয়। আচ্ছা, আপনি বলা বন্ধ অভ্যাসটা কি তুমি ছাড়্‌তে পার্‌বেনা ? তোমার কোর্টের হাকিম হুজুর নই আমি, বা তোমার নানা মশাই বা দাদা মশাইও নই। ফের আপনি ব'লেছ কি—(একটা কিল দেখাইয়া) বক্‌শিষ পাবে। সুবোধ বালকের মত আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে যাও। তা না হ'লে ছুটি পাবে না, আমার নজরবন্দী থাক্‌বে।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের ভাবগতিক দেখিয়া আফতাব আলি "ছোঁড়াটাকে ফুল গাছ গুলোর গোড়া খুঁড়ে দিতে বলি গিয়ে" বলিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

আনওয়ার হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু দুটি ডাক্তারের কৃত্রিম গম্ভীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া কহিলেন, "তোমার বেহায়ামু দেখে, বেচারা আফতাব পালিয়ে গেল।"

"বাঁচলুম, ও থাক্‌লে কথা বলার অসুবিধা হ'ত, এখন আসল কথাটা ব'লে ফেলে আমার ঘটকালির পথটি পরিষ্কার ক'রে দাও।"

"কথায় বলে কচ্ছপের কামড় মেঘ না ডাকলে ছাড়েনা। তা তোমার মত প্রকাণ্ড কচ্ছপের জেদের কামড় নীরবে সহ্য করা অপেক্ষা, ভালয়

ভালয় তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলে যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতিই পাব।"

"এত জায়গা থেকে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ আন্‌লুম, তা তোমার ভাই পছন্দই হ'লনা। ক'ল্‌কাতার ডেপুটি সাহেবের একমাত্র কন্যা, দেখিতেও বেশ ভাল, তাতেও তোমার মন উঠ্‌ল না। এখন দেখ্‌চি উকিল মহাশয়ের জন্য ফরমাইশ দিয়ে, কৃষ্ণনগর থেকে মেয়ে গড়িয়ে আন্‌তে হবে।"

আনওয়ার আলি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মহামহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত ডাক্তার আহম্মদ হোছেন এম, ডি, সাহেবের অত বড় অনুগ্রহ লাভের আশা করা আমার মত সামান্য দিনমজুর ব্যক্তির পক্ষে বাতুলতা মাত্র।"

ডাক্তার সাহেব সরল মধুর উচ্চহাস্যে সমস্ত ঘরখানা মুখরিত করিয়া বলিলেন, "তোমার কথার বাঁধুনি ও বহর দেখে আমার একটা পুরাতন গল্প মনে প'ড়্‌ল।

একজন বাঙ্গালি মসলমান ভদ্রলোক অপর একজন পশ্চিমাঞ্চলের ভদ্রলোকের সহিত কথা প্রসঙ্গে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করায়, দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনাকে অতি হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য, নিজের নাম উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে, "খাকছার, গোনাহগার, বান্দায়ে লাচার, বান্দাকা নাম, আব্দল গফ্‌ফার" বলিয়া পরে পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটিকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে ঐ ভদ্রলোক একটু ঢোক গিলিয়া "গু, দার গু; কালো কুকুরের গু, আমার ডাক নাম সেখ ভিকু," বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। তা ভাই তুমিও দেখচি এক মহাশয় শব্দ ব্যবহার শুনিয়া, ভিকু মিয়ার চেয়েও উঁচিয়ে উঠ্‌লে।"

এই কথায় উভয়েই হো হো করিয়া হাসিয়া ঘরখানা কাটাইয়া

ফেলিবার মত করিলেন। পরে হাস্যবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক ডাক্তার প্রথমে কথা কহিলেন।

"হেসে হেসে অনর্থক সময় নষ্ট করায় কোনই লাভ নাই, কাযের কথা বলা দরকার। আচ্ছা তোমার বিয়ে না ক'র্‌বার কারণটা কি ? আমায় শীঘ্র ক'রে ব'লে ফেল, আমার দম বন্ধ হবার মত হ'য়ে আস্‌চে।"

আনওয়ার আলি ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এই জন্যই মেয়ে-মানুষরা বলে, যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়া-পড়্‌সির ঘুম নেই, তোমার দেখ্‌চি ঠিক সেই রকম। আমি বিয়ে করি বা না করি, তোমার পেটে ব্যথা ধ'রেছে কেন বল দেখি ?"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "ব্যথা কি আর সাধে ধরে, কারণ আছে ব'লেই ধ'রে থাকে। বিধবা হ'য়ে দ্বিতীয় বিবাহ না কর্ত্তে পারায় যেমন হুড় হুড় করে বেশ্যার সংখ্যা বেড়ে যাচ্চে ; তেমনি পুরুষও গিন্নীহীন হ'য়ে দ্বিতীয় গৃহিণী না আনলে লম্পটের সংখ্যা পাছে বেড়ে পড়ে, সেই চিন্তায়ই এই অধমের মাথা ব্যথা ও পেট ব্যথা। এখন বুঝ্‌লে উকিল সাহেব ?"

আনওয়ার আলি হাসিমুখে বলিলেন "হার মান্‌লুম ভাই, হার মান্‌লুম। তোমার সঙ্গে তর্কে আমি পেরে উঠ্‌ব না। লুকোচুরির আর দরকার নেই, মোট কথা আমি ভাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

বিদ্রূপের স্বরে ডাক্তার বলিলেন "প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ! কোন্ নবীনার শ্রীপাদপদ্মে ? তবে খুলে ব'ল্লেই হয়, প্রতিকারের চেষ্টা দেখি।"

জড়িতকণ্ঠে আনওয়ার উত্তর করিলেন "পার্‌বে না গো, সে

পারবেনা। শুন্‌লে হয় ত হেসেই উড়িয়ে দেবে।"

একটু থামিয়া দয়াদ্র কণ্ঠে ডাক্তার বলিলেন "উড়িয়েই দিই, কি ধ'রে দিই, মেহেরবানি করে একটীবার ব'লেই দেখনা, ক্ষ'য়ে যাবে না ত'।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

— — :০: ——

আনওয়ার যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন; ও স্বপ্ন ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত ডাক্তার সাহেবকে বলিয়া মনের গুরুভার কিঞ্চিৎ লাঘব করিলেন।

আমাদের ডাক্তার সাহেব শুধু যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় সুনিপুণ ছিলেন তাহাই নহে। হোমিওপ্যাথিক বিদ্যায়ও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে কোন কোন ডাক্তার যেমন অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা কাল ধরিয়া, রোগীর উর্দ্ধতন তিন চারি পুরুষের মধ্যে কবে কাহার মাথা ধ'রেছিল বা, কে কবে হোঁচট্ খেয়ে প'ড়ে পায়ে বেদনা অনুভব ক'রেছিল, সে পর্য্যন্ত রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, কিয়ৎক্ষণ চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হওয়ার পর ঔষধের বন্দোবস্ত আরম্ভ করেন; ডাক্তার সাহেবও সেইরূপ আনওয়ার আলির রোগের ব্যাপার রোগীর মুখে শুনিয়া, বাম তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে অর্দ্ধচন্দ্র সৃজন পূর্ব্বক, উহাতে বাম কপোল রক্ষা করিয়া, কিয়ৎক্ষণ হোমিও-ডাক্তারসুলভ মৌনাবলম্বন করিলেন। পরে হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বপ্নদৃষ্টা

"তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে আমি অবাক হ'য়ে গেছি। আচ্ছা ভাই তোমার স্বপ্ন-রাণীর সৌন্দর্য্য বর্ণনাটা একবার খোলসা ক'রে বল দেখি ?"

আনওয়ার বলিলেন, "আমি ত কবি নই, যে একধার থেকে রূপ বর্ণনা ক'রে যাব। তোমরা যাকে বল মোটামুটি সুন্দরী, সেই রকম আর কি।"

"আইন ব্যবসায়ীরা কেবল আইনের ধারা বসাতেই মজবুত দেখ্‌চ; আরে ভাই, মোটামুটিই হউক আর রোগা-রুগীই হ'ক, একটা ডেস্‌ক্রপসান্‌ ত দিতে হ'বে। তুমি তার চেহারাটি দেখ্‌লে, আর বায়ান ক'র্‌বে কি শ্যামা মুদ্দফরান ?"

আনওয়ার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি নাছোড়বান্দা, তোমাকে ফাঁকি দেয় কার সাধ্য ? রূপ বর্ণনা শুন্‌তে চাচ্চ, তবে শুন। বিশ্বাস কর বা না কর, আমি ব'লেই খালাস।

নাকটা এত উঁচু নয় যে, কাড়্কাঠে ঠ্যাকে। আর চশমা দিয়ে দেখ্‌বার মত খ্যাঁদাও নয়। চোখ দুটো যে শুধু দেখ্‌বার জন্যই আছে, তা নয়, তাই ব'লে ইলিষমাছ ধরা জেলেডিঙ্গির মত লম্বাও নয়। দুটোর মধ্যে থেকে বেছে নিলে যেমনটি হয়, সেইরূপ। দেহের গড়নটা বেশ লম্বা। তুমি বোধ হয় মনে ক'র্‌চ সূর্য্যে মাছ পুড়িয়ে খেতে পারে। আমি যেমনটি পছন্দ করি, ঠিক তেম্‌নটি।"

আনওয়ার একটু থামিয়া চাপা হাসি হাসিয়া আবার বলিলেন, "কেমন, বর্ণনাটা ঠিক ব'ল্‌তে পেরেছি ? অমন ক'রে তাকাচ্চ কেন ? মনে ধ'র্‌ল না বোধ হয় ? তবে আরও শুন।

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা
পদ নখে প'ড়ে তার আছে কতগুলা।
মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া,
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।"

এইবার মনের মত হ'য়েছে ত'?

"বাপরে বাপ্, চোখ দেখে ভয় পাচ্চে। ক্ষুধিত বাঘের মত ঘাড়ে এসে লাফিয়ে প'ড়্ল বুঝি, পালাই" বলিয়া যেমনি আনওয়ার উঠিতে গেলেন, ডাক্তার সজোরে ডান হাতটি ধরিয়া একটা টান দিয়া বসাইয়া, কৃত্রিম রোষ প্রকাশে গর্জ্জন ও ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন।

"দেখ আনওয়ার ভাল হ'চ্চেনা ব'লে দিচ্ছি। তোমার মত বেয়াড়া ফাজিলকে উচিৎ শাস্তি দিয়ে তবে অন্য কাজ।"

আনওয়ার আলি মুখে রুমাল দিয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "গুণ্ডার গুণ্ডা, বান্দার নাম" আর বলা হইল না, উভয়ে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—— :o:——

পাশের বাড়ীর ছাদের কার্ণিশের উপর দুইটী কপোত কপোতী নিশ্চিন্ত বসিয়া প্রেমালাপ করিতেছিল। আনওয়ারের দৃষ্টি খোলা জানালাটির ভিতর দিয়া ঐদিকে পড়ায় তিনি উহাদের আলাপ দেখিতে পাইলেন। একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া, অবাধ্য চোখ দুটোকে সেই দিক হইতে ফিরাইয়া লইলেন। এবং ডাক্তারের হাসি ভরা মুখের উপর নিজের কাতর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে বলিলেন—

"দেখ ভাই, আমার স্বর্গীয়া স্ত্রীর বিষয় তুমি সকলই অবগত আছ। তার যে কেবল রূপই ছিল, তা নয়। তার গুণগ্রাহি শুধু আমি কেন, যে দু'দণ্ড তাকে দেখেছে বা তার সঙ্গে কথা ক'য়েছে সেই তার গুণ ভুলতে পারেনি। এই কারণেই তার মৃত্যুর পর আর সে রকমটি পাব'না ব'লে, এক রকম প্রতিজ্ঞাই ক'রেছিলাম, যে আর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিব না। এখন দেখ্‌চি, সেটা আমার ভ্রম; কারণ মোদ্দায় জেন্দায়, স্বপনে জাগরণে, সকলে মিলেই, 'বিয়ে বিয়ে' ক'রে আমাকে পাগল ক'রে তুলেছে।"

এই বলিয়া উকিল সাহেব প্রাণের বন্ধু ডাক্তারের নিকট স্বপ্নদৃষ্টা

বালিকার সৌন্দর্য্যের যথাযথ বর্ণনা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া, পরে গম্ভীর ভাব ধারণ পূর্ব্বক মত প্রকাশ করিলেন যে, ' আমার মৃতা স্ত্রীর আনীতা সেই অনিন্দ্যসুন্দরী স্বপ্ন-রাণীকে না পেলে জীবনে আর বিবাহের নাম উচ্চারণ পর্য্যন্ত করিব না।"

ডাক্তার –"দেখ আনওয়ার তামাসা ক'চ্চিনা, তুমি হয় ত বিশ্বাসই ক'র্‌বেনা, আমার কথা সত্য কি না। তোমার স্বপ্নদৃষ্টার যে রকম চেহারা বর্ণনা ক'র্‌লে আমার মনে হ'চ্চে, শুধু মনে হ'চ্চে কেন, নিশ্চয়ই বোধ ক'চ্চি, আমার শ্যালীর মুখের গড়ন অনেকটা সেই রকম।

কি, একেবারে অবাক হ'য়ে গেলে যে? না, আমার কথা বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌চ না। তুমি হয়ত মনে ক'র্‌চ চোখে দেখায় আর কানে শুনায় অনেক তফাৎ, এই ত'? সেটা অবশ্য ঠিক। কোন রকমে একবার তোমাকে দেখাতে পা'র্‌লে হ'ত।"

আনওয়ার আলি বলিলেন, "তা'কি হয় ভাই; তোমার যেমন কথা; ওহ! তুমি যে বিলেত ফের্‌তা, সাহেব লোক আছ। বিলাতের কোর্টসিপের ব্যাপারটা বুঝি হঠাৎ তোমার মনে প'ড়ে গেল? এ'তো আর ভাই হিন্দুর ঘরের অনূঢ়া কন্যা নয়, যে বরপক্ষ থেকে কত লোকই এসে কতবার, আবার সময় সময় হবু বর নিজেও এসে পাকা কাঁচা দেখে যা'চ্চে; আর কত বরের তরফ থেকেই ঝুড়ি ঝুড়ি আশীর্ব্বাদ হচ্চে। কত আশীর্ব্বাদের মজলিসে মেয়েকে রং ফলিয়ে ডানা কাটা পরিটি সাজিয়ে পাঁচজনের মাঝে এনে হাজির ক'চ্চে; আবার বরপক্ষ মেয়েকে চালিয়ে, ফিরিয়ে, জিভের আড় ভেঙ্গেছে কিনা দেখ্‌বার জন্য অনাবশ্যক এ প্রশ্ন, সে প্রশ্নের উত্তর নিয়ে, শেষে একটু

গলদে বা সামান্য পনের টাকার কম বেশীর জন্য, চোক মুখ টানাটানি ক'রে, কনের পিতা বেচারার দস্তুর মত অন্ন ধ্বংস ক'রে, তবে আটের গায়ে শূন্য বসিয়ে স'রে প'ড়্ছে। বেশ ভাই, তোমার শ্বশুরদের দেশে মেয়ে দেখাবার পদ্ধতি হ'য়েছে নাকি ?"

"আরে তা নয়, তুমিও আচ্ছা পাগল দেখ্‌চি। আমি কি আর সত্যিই ব'ল্‌ছি, আর আমি বল্লেই কি তাঁ'রা আমার কথা শুনে তোমাকে তাদের মেয়ে দেখাবেন। দেখাতে পাল্লে হ'ত ব'ল্লাম, ওটা একটা কথার কথা।"

আর কোন কথা না থাকায় কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন। সহসা ডাক্তার সাহেব বিকারগ্রস্ত রোগীর মত, হঠাৎ চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ঠিক হ'য়েছে, ঠিক হ'য়েছে, আহা! এমন সুন্দর কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।"

না জানি কি আবশ্যকীয় কথা ভাবিয়া, আনওয়ার আলি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন।

তখন ডাক্তার সাহেব আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন। "আমার শ্যালকটি আলিগড় কলেজ হইতে বি, এ, ডিক্রি লইয়া আসিয়া এইবার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটগিরীর ক্যাডেট হ'য়েছে। সে ফিরে আস্‌বার পর ফটো ক্যামেরা নিয়ে দিন কত খুবই ব্যস্ত হ'য়েছিল। এবং সেই সময় তাহার দুই ভগ্নীকে পিতামাতার সহিত বসিয়ে, একত্রে একটা গ্রুপ ফটো তুলেছিল। তার এক কপি আমি আমার স্ত্রীর নিকট হ'তে নিয়ে, আমার দেরাজের টানার মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। আমি বাড়ী গিয়ে সেইটে খুঁজে তোমাকে শীঘ্রই ডাকে পাঠিয়ে দিব।

আর ভাই, তোমার বর্ণনার অনুরূপ পাত্রীই এন্‌সা আল্লাহ, তোমার করে সমর্পণ করিব।

তোমার এই চল্‌চলে মুক্তাটীর জন্য, আমাকে ডুবুরি হ'য়ে পারস্য উপসাগরের অতল জলগর্ভে নামিতে হয়, বা এরিওপ্লেনে উঠে কৈলাস শিখরের রত্নরাজির মধ্য হইতে, বরফের উপরে ব'সে হাতড়ে বার ক'র্ত্তে হয়, তা'ও ক'র্‌ব। নিশ্চয় জেনো ভাই, এ নারদ কিছুতেই পেছপাও হ'বে না। সমুদ্র মন্থনের অভিনয় হইতে আরম্ভ ক'রে, সসাগরা ধরণীর কোন স্থানেই, তার বন্ধুর স্বপ্ন-মণির অন্বেষণ ক'র্ত্তে বাকি রাখ্‌বেনা।"

পরে একটু হাসিয়া আনওয়ারের আশাহীন ম্লান গম্ভীর মুখের উপর হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "আর এক কথা ভাই মানুষ মাত্রেই লোভের বশীভূত, আর এই পাপ লোভে পড়িয়াই মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে সর্ব্বপ্রকার ন্যায় অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। আমিও সেই মানব জাতির মধ্যে একজন। তুমি আমার আত্মীয় ও বন্ধু, সেইজন্য বক্‌শিষ চাওয়াটা একটু বেখাপ ঠেকে বটে, কিন্তু লোভ সে কথা মানে না, বলে, তুমি বড় বোকা ; চোক কান বুঁজে কথাটা পেড়ে ফেলনা একবার।"

"তুমি ভাই আমার উপর রাগ ক'রোনা, আমার কোন দোষ নাই, দোষ ঘাট যা কিছু সমস্তই লোভের।"

আনওয়ার আলি ডাক্তার সাহেবের উপর একটা মধুমাখা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "দয়াময়, একবার দয়া প্রকাশে আপনার লোভ মহাশয়কে বলুন যে, আপনি যদি ভিখারীর শূন্য হৃদয়খানি

বাঞ্ছিত ভিক্ষার দ্বারা পূরণ ক'র্তে পারেন, তা' হ'লে অভাগা ভিখারী আপনার যাহা কিছু প্রার্থনা অম্লান বদনে মঞ্জুর ও পূরণ ক'র্বে।"

ডাক্তারের সরল মধুর হাস্যে দ্বিতল কক্ষ মুখরিত হইল। বলিলেন, "এইবার লোভ বাবুর স্ফুর্ত্তি দেখে কে, মোটা বক্‌শিষের আশায় পূর্ণ উদ্দামে ঘটকালি ক'র্ত্তে চ'ললেন।"

"নাও ভাই তোমার ঘটকালির চেষ্টা এখন রাখ। চল, পেটের চেষ্টায় একবার বাজারের দিকে যাওয়া যা'ক্" বলিয়া আনওয়ার আলি টেবিলস্থ ঘণ্টাটির উপর জোরে একটা থাবড়া মারিলেন।

ঘণ্টার কিড়িং শব্দ হইবা মাত্র আবদুল খানসামা, "জি, হুজুর" বলিয়া দ্বার সন্নিধানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

উকিল সাহেব তাহাকে ও পুরুষোত্তম মালীকে ধামা টুক্‌রিসহ বাজারে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে আজ্ঞা করিয়া চটিজুতা পরা ডাক্তারের হাত ধরিয়া নীচে আসিলেন।

পৈতৃক পুরাতন সরকার বৃদ্ধ নিয়ামৎ খাঁ সসব্যস্তে উঠিয়া আসিয়া "বাজার থেকে তোমার গিয়ে কি কি আন্‌তে হবে?" জিজ্ঞাসা করায় আনওয়ার আলি অন্যমনস্ক ভাবে মৃদুস্বরে "তোমাকে আজ আর যেতে হ'বেনা, আমরাই যাচ্ছি" বলিতে বলিতে উভয় ভ্রাতা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন ও নিকটবর্ত্তী বাজারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পথে চলিতে চলিতে দু'জনে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, তার মধ্যে অধিকাংশই আনওয়ার আলির বিবাহ ও স্বপ্নদৃষ্টা আনন্দাসুন্দরীর রূপ বর্ণনা সম্বন্ধে।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

আজ রবিবারের বাজার। বাজারে যেমন মাছ তরকারির আমদানি, তেমনি লোকেরও ভিড়। উকিল সাহেবকে আজ হঠাৎ বাজারে দেখিয়া অনেকেই সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। আবার কেহ কেহ আমাদের সৌম্যমূর্ত্তি যুবক ডাক্তারকে দেখিয়া, অতি সন্তর্পণে চোখের ইঙ্গিতে পার্শ্বের লোকদিগকে এবং বেশীর ভাগ আবদুল খানসামাকে, ইনি কে, কোথা থেকে আস্‌চেন, বাবুর কে হন? ইত্যাদি প্রশ্নে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

বেচারা আবদুল সাধ্য মত চাপা গলায়, ডাক্তার সাহেবের পরিচয় দিতে দিতে শেষে আর না পারিয়া মৌনাবলম্বন করিল।

বাজার করা শেষ হইলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দুই বন্ধুতে পূর্ব্ব বর্ণিত দ্বিতল কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে স্নানের বন্দোবস্ত হইলে স্নান করিয়া আহারে বসিলেন। ভিন্ন ভিন্ন রকমের সুন্দর সুন্দর ডিস্ ও রেকাবিতে, রকমারি অন্ন ব্যঞ্জন দেখিয়া সহাস্যে ডাক্তার বলিলেন, "পেটটা যদি রবারের হ'ত তাহ'লে সবগুলি পুরে নিয়ে পাঁচ সাত দিনের মত নিশ্চিন্ত হওয়া যে'ত। একটা যজ্ঞের ব্যবস্থা ক'রে ফেলেচ দে'খছি।

এতগুলো রান্না অনর্থক নষ্ট করার চেয়ে, জন কতক বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়ে দিলে বরং ইহার সদ্ব্যবহার হ'তো।"

উকিল সাহেব ডাক্তারের মুখের দিকে সানন্দ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "ডাক্তারদের মোটেই সাহস নাই। বিশেষতঃ আহার সম্বন্ধে; সামে একটু বেশী খাবার দেখলেই, অমনি চম্‌কে উঠেন। সদাই ভয়, একটু বেশী ডোজে আহার্য্য পেটে প'ড়লে পাছে উদরাময় হ'য়ে পড়ে। কাজ নেই ভাই অত ল্যাঠায়; তার চেয়ে তুমি না হয়, তোমার হিসাব মত গুণে গুণে গ্রাস মুখে তোল। দোয়াত, কলম ও কাগজ দেবো নাকি? কি জানি, যদি দুই এক গ্রাস বেশী পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তবেই ত' সর্ব্বনাশ!

আর এই দেখ, পেটুক আনওয়ার কি রকম খায়। আনওয়ার রোজই এই রকম খেয়ে থাকে। তা আজ না হয় দুই একটা বেশী হ'য়েছে মাত্র। তা ভাই, তুমি খাও, যা বাকি থাক্‌বে নষ্ট হবেনা। সেগুলো খাবার লোকও বাড়ীতে বেশ আছে।" বলিয়া, উকিল সাহেব প্রথমেই খাইবার পথ প্রদর্শন করিলেন।

বাস্তবিক কথাও তাই। আনওয়ার আলির জন্য প্রত্যহই কোর্‌মা, কালিয়া, চপ এবং কাবাব লইয়া আট দশ রকমের খাবার তৈয়ার হ'য়েই থাকে। বেশীর ভাগ কুটুম্ব আসায় আজ মাছের টিকিয়া, কোফ্‌তা, বড় চিংড়ী ও মুরগীর চপ, টক ও মিষ্টি দিয়ে ডিম রান্না, পটোল থালি এবং ছের্‌কা দিয়ে কচি সশা ও বড় পেয়াজ কুচন চাট্‌নি। দধিটা, আনওয়ার আলি ইচ্ছামত কোন কোন দিন খেতেন। তবে রোজই খাবার সময় সাম্‌নে আসিত।

স্বপ্নদৃষ্টা

বাড়ীতে দুই তিনটী দোয়া গাই থাকায়, চিনি দিয়ে প্রত্যহই দই পাতা হইত। আজ আহারের সময় সেই সুন্দর ঘন দুধের চিনি-পাতা দই আসিয়া দেখা দিল। সাদা ভাতের পরিবর্ত্তে আজ পুরাতন দাদখানি চাউলের পোলাউ ও জর্‌দা ছিল।

আজকাল প্রায় সকল বড় সংসারের নিয়মই, দুই রকম রান্না করা। ভাল মাছ-মাংসের ঝোল খাবেন বাবুরা; আর দাস দাসীর বেলায়, ছেঁচ্‌কি চচ্চড়ি, ডালের পানি, খুব বেশী হ'ল ত' ছোট চিংড়ী বা চুনো পুঁটির ঝোল। এ বাড়ীর নিয়ম কিন্তু সে রকম নয়।

আনওয়ার আলির স্বর্গীয়া স্ত্রীই এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, "দাসী চাকরেরা ঘাড়ে ক'রে ব'য়ে এনে, হাতে ক'রে তৈরী ক'রে, ভাল ভাল খাবার আমাদেরকে দেবে, আর নিজেরা খারাপগুলো নিঃশব্দে খেয়ে উঠ্‌বে! তারা অবশ্য মুখ ফুটে ব'ল্‌তে পারবে না, যে কেন আমরা প্রত্যহ খারাপ খেতে যা'ব। কিন্তু আমাদের নিজেদের সেটা বিচার করা খুব উচিত। আর তা' না ক'ল্লে খোদার কাছে গোনাহ্‌গার হ'তে হবে।

মানুষের প্রাণ ত'! পাঁচ বার চোখের সামে দেখ্‌চে, হাতে ক'রে নাড়্‌ছে চাড়্‌ছে, খাবার ইচ্ছা হওয়াটাও নিতান্ত অসঙ্গত নয়। আর সেই খাবারগুলোর একটুও উহাদিগকে না দিয়া, আমরা নিজে যখন চর্ব্বা, চোষ্য ক'রে খেয়ে নেব, তখন নিশ্চয়ই উহাদের অজ্ঞাতসারেও একটা নিশ্বাস প'ড়্‌বে। সে আমি হ'তে দিব না।"

তিনি ইহাও বরাবর ব'ল্‌তেন, "আমরা যদি কোন জিনিষ তৈয়ার করি, আর ঝি চাকরেরা তাহা না দেখ্‌তে পায়, সে সমস্ত আমরা

উহাদিগকে না দিয়েও খেতে পারি, তাতে বরং ততটা দোষ হয় না; কিন্তু, দেখে শুনে, নেড়ে ঘেঁটে, তৈরি ক'র্‌বে আর একটুও খেতে পাবেনা, এটা বড়ই অন্যায়।"

তিনি আজ স্বর্গে, কিন্তু তাঁর বাঁধা নিয়মগুলি ঠিক সেই রকমই চ'লে আস্‌চে। তাঁহার আমলের রাঁধুনি, ঝি প্রভৃতি আজিও বর্ত্তমান।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

— :০:—

আনওয়ার আলি পৈতৃক ভদ্রাসন ছাড়িয়া যখন জেলাকোর্টে ওকালতি করিবার জন্য প্রথম বিদেশ যাত্রা করেন, বৃদ্ধা ঝি দুখীর মা ও বৃদ্ধ নিয়ামৎ খাঁ তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল।

বুড়ি কাঁদিয়া জিদ ধরিল, "বাবা তুমি বিদেশে যা'বে, বউবিবিও সঙ্গে যাবেন, আমরা তবে কার মুখ চেয়ে থাক্‌বো? বুবুজান বেহেস্তে গিয়াছেন, কিন্তু তোমাকে আমার কোলেই দিয়ে গিয়েছিলেন। বাবা, তোমাকে বুকে ক'রে সকল দুঃখ ভুলেছিলাম, এক দিনের তরেও এই অভাগী তোমাকে বুক থেকে নামায়নি। তোমার সামান্য একটু গা গরম হ'লে, নাওয়া খাওয়া ত্যাগ ক'রে, তোমার মুখের দিকে চেয়ে কত রাত্রি কাটিয়েছি। তাই আজ, তুমি বিদেশে যা'বে শুনে প্রাণের ভিতর থেকে, কে যেন কেঁদে কেঁদে ব'ল্‌ছে, বুড়ি, তোর আনু তোদের ছেড়ে কোথায়, কোন্‌ দেশে চ'লে যা'বে, সেখানে তাকে কে দেখ্‌বে, কে যত্ন ক'র্‌বে? খোদা না করে, কোন অসুখ বিসুখ হ'লে, তোর মত প্রাণ দিয়ে কে আনুর সেবা ক'র্‌বে?

বৌবিবি ছেলেমানুষ, তিনি কি সে রকম ক'র্‌তে পার্‌বেন?

সত্যই বাবা আমি মন বুঝাতে পারবোনা। কচি ছেলে নিয়ে বৌ-বিবির আমার কত কষ্ট হ'বে! ননীর গতরে কষ্টের আঁচ সইবে না। সকলকে ছেড়ে নূতন জায়গায় গিয়ে, না জানি বাছা আমার কতই ঘাব্‌রা'বে। আজ যদি তোমার মা জান্‌ বেঁচে থাক্‌তেন, তা হ'লে তাঁকে কি ছেড়ে যেতে পার্ত্তে বাবা? তবে আমাকে কেন ছেড়ে যাবে? আমি যে তাঁর দাসী, আর তোমার দাসী মা।" এই কথা বলিয়াই বৃদ্ধা ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বেচারা নিয়ামৎ খাঁ, সেও ব'ল্‌তে ছাড়ে নাই। মুখে হাসি, চক্ষে কান্না নিয়ে সেও বলিতে লাগিল, "তোমার গিয়ে এ হতভাগা বুড়োর শোক তাপ ভুলোনো, হীরের খেল্‌না, তোমার গিয়ে কাছ ছাড়া হ'লে, সে তোমার গিয়ে একদণ্ডও থাক্‌তে পার্‌বে না। বাবা, আমার রাজা বাবু আমাকে, তোমার গিয়ে যে সাত রাজার ধন মাণিকের খেল্‌না দিয়েছিলেন, আমি, তোমার গিয়ে সর্ব্বস্ব খুইয়ে এসে সেই খেল্‌না পেয়েই তোমার গিয়ে বেঁচে আছি। এ জ্যান্ত খেল্‌না কাছ ছাড়া হ'লে তোমার নেয়ামৎ খাঁ, তোমার গিয়ে জলে পুড়ে দেহত্যাগ ক'র্‌বে।"

ইহাদের ন্যায় আবদারে আনওয়ার আলি লজ্জিতভাবে শুধু এই উত্তর দিলেন, "বেশ ত', তোমরা আমার মুরুব্বির মত সঙ্গে যা'বে, সেত' সুখের বিষয়। অচেনা দেশে গিয়ে তোমাদের নানা কষ্ট ও অসুবিধা হ'তে পারে, সেই জন্যই, আমি তোমাদের রেখে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা দুঃখিত হ'বে জান্‌লে আমি কখনও নিষেধ ক'র্ত্তাম না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

একান্ত অনুগত, শোক দুঃখ জর্জ্জরিত এই দুইটি হতভাগ্যের সরল স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিবার ক্ষমতা, আনওয়ার আলির ছিলনা। কারণ দুঃখীর মার স্বামী মারা যাইবার পর, সামান্য দু'চার বিঘা জমি ও হালের গরু যাহা কিছু ছিল, সে সমস্তই উহার দেবরগণ ফাঁকি দিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল। ক্ষমতা হীনা বিধবা শুধু দুঃখীর মুখ চাহিয়া, নীরবে সমুদয় অত্যাচার সহ্য করিয়া লইল। কিন্তু সেই কাঙ্গালের ধন দুঃখী যখন বিসুচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া, দুই দিনের দিন মাতাকে নিজ স্মৃতি স্বরূপ "দুঃখীর মা" নাম উপহার দিয়া জনমের মত চিরবিদায় লইল; সেইদিন দুঃখীর মা'র সহ্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

স্বামী পরিত্যক্ত গৃহখানিতে অসহ্য বেদনা লইয়া, কোনমতে চল্লিশটি দিন কাটাইয়া দিয়া, সে যখন শূন্য হৃদয়ে জমিদার বাড়ীতে আসিয়া পড়িল, জমিদার গৃহিণী তখন বড় স্নেহে তাহাকে নিজগৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

দুঃখীর মা জমিদার বাড়ীতে আসিবার ছয় মাস পরে যখন আনওয়ার আলি ভূমিষ্ট হইলেন, তখন কি জানি কোন্ আশায় সে দুঃখ সাগরে

ভাসিতে ভাসিতে, আশার তৃণবৎ অবলম্বন ভাবিয়া প্রাণপণে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। এরূপ ভাবে ধরিয়াছিল যে, স্তন পানের সময় ব্যতিত মাতার ক্রোড়ে পুত্রকে দিতে পারিত না।

শিশুর খাওয়ান, স্নান করান, মলমুত্র ইত্যাদির ঝক্কি দুঃখীর মা আনন্দচিত্তে সম্পন্ন করিত। কেহ এই সকল কার্য্যে তাহাকে বাধা দিলে, সে অভিমানভরে কাঁদিয়া ফেলিত।

অবশ্য আনওয়ার আলির মাতা কখনও বাধা দিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "আহা! জ্বলা-পোড়া প্রাণটা ওর, ও যা'তে সন্তুষ্ট থাকে তাই করুক, তোমরা কেহ ওর কাজে বাধা দিওনা।"

আনওয়ার আলির ছয় বৎসর বয়ক্রম কালে তাহার কনিষ্ঠ ভগ্নী হাজেরা ভুমিষ্ট হয়। কিন্তু এই কন্যা জন্মগ্রহণ করিবার পর, মাতাকে সুতিকা গৃহ হইতে আর বাহির হইতে হয় নাই।

মৃত্যু শয্যায় শয়ান থাকিয়া, পরম স্নেহের ধন প্রথম পুত্র আনওয়ার আলিকে বুকে লইয়া, চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে যুক্ত করে আনওয়ারের মাতা মনোজাত করিয়া, বাষ্প-গদগদ-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন "দয়াময় খোদা, আমার পুত্র কন্যা ও স্বামী এই পাঁচটী প্রাণীকে তোমার হেফাজতে দিয়া চলিলাম।" তারপর বক্ষাস্থিত পুত্রের মুখ ও মস্তক আশীষ চুম্বনে ভরিয়া দিয়া, নিজের বক্ষের ধনটি, দুঃখীর মার বুকে তুলে দিয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "দুঃখীর মা, আমার গণা দিন ঘুনিয়ে এসেছে, আর বেশী দেরি নাই, তোর সান্ত্বনার ধন আনুকে তোকে দিয়ে যাচ্ছি।"

আর হতভাগ্য নিয়ামৎ খাঁ, তার কি না ছিল? ঘর ভরা পুত্র

কন্যা, সারি সারি মরাই ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু; সবই ছিল। নিজ জমার ও ভাগে জমি চষিয়া যে ধান্য বা রবিফসল পাইত, তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া, সম্বৎসরের ব্যয় হইয়াও অনেক বাঁচিয়া যাইত।

মোট কথা, আজ কালকার বাজারে দুশ' টাকা বেতনের একজন মাত্র রোজগেরের, নাতিবৃহৎ সংসার যেরূপ ভাবে চলিয়া থাকে, তদপেক্ষা স্বচ্ছল ভাবেই নিয়ামৎ খাঁর দিন গুজরাণ হইত।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তাহার কপালের সুখ বেশী দিন থাকেনা। নিয়ামতের ভাগ্য ও অধিকদিন সুপ্রসন্ন থাকিল না। দুর্দ্দান্ত কলেরা রাক্ষসী তাহার সমস্ত পুত্র কন্যা, মায় তাদের গর্ভধারিণীটকে পর্য্যন্ত হিড় হিড় করিয়া টানিয়া নিজ বিশাল উদরে পুরিয়া দিয়া; কেবল পাকা হাড় বোধে নিয়ামৎকে ছাড়িয়া গেল।

হৃদয় বিদারক শূন্যতা লইয়া হাহাকারধ্বনি তুলিয়া, সোনার সংসার শ্মশান জ্ঞানে, উন্মাদের ন্যায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, নিয়ামৎ যখন পথে পথে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল; তখন স্বর্গীয় মহাপ্রাণ জমিদার মৌলুবী মোবারক আলি সাহেব, এই ভাগ্য বিতাড়িত পথের কাঙ্গাল নিয়ামৎকে, অতি যত্নসহকারে নিজের বাড়ীতে আনিয়াছিলেন।

তারপর ছয় মাসের শিশুপুত্র আনওয়ার আলিকে উহার কোলে দিয়া স্নেহমাখা মধুরস্বরে বলিয়াছিলেন, "নিমু দেখ্ দেখি তোর জন্য কি সুন্দর খেলনা এনেছি, এই খেলনা নিয়ে খেলা দেখি।"

নিজের খেলনা শূন্য জ্বলন্ত বুকে মৌলুবী সাহেব প্রদত্ত অমূল্য খেলনা ধারণ ক'রে, হতভাগ্য নিয়ামতের বুকের আগুন অনেক পরিমাণে নির্ব্বাণ হইয়াছিল। এবং কিছুদিন ঐ জ্যান্ত খেলনার সঙ্গে খেলিয়া,

স্বপ্নদৃষ্টা

উহার খাওয়াতে খাইয়া, উহার মধুর হাসিতে হাসিয়া, কান্নায় কাঁদিয়া, বেচারা সত্য সত্যই সব দুঃখ ভুলিয়া গিয়া, ঐ খেলনাময় হইয়া গিয়াছিল ; শুধু গিয়াছিল নয়, আজিও হইয়া আছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—o—

এতেই বলে "কথা লতা"। ভদ্রলোক দুটিকে আহারে বসাইয়া আসিয়াছি, সে কথা মনেই নেই। একবার দেখা যাউক, তাঁরা কি করিতেছেন।

কথায় কথায় এখনও তাঁদের আহার শেষ হয় নাই। জয়দা খাইতে খাইতে আহম্মদ হোছেন সাহেব বামহস্ত সংলগ্ন কব্জী ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়াই বলিলেন "উহ! বারটা বেজে গিয়েছে, এখনও খেয়ে উঠ'তে পাল্লুম না! আবার একটু বিশ্রাম কর্ত্তেও হ'বে ত'; তা হ'লে দেখ্‌চি আজকে আর আমার যাওয়া হয়েছে!"

সুবাসিত খস্‌খসের নীল রংয়ের সাবান ও তওলিয়া হস্তে ভৃত্য বারাণ্ডায় অপেক্ষা করিতেছিল। ইঙ্গিতমাত্র সে চিলিমৃচি ও পানি-ভরা নূতন কলাইকরা বদনা লইয়া উপস্থিত হইল।

উভয় বন্ধু হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। আব্দুল একডিবা সুবাসিত ছাঁচি পান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ও সামান্ত বিলম্ব করিয়া "বাবু আর কোন ফারমাইশ আছে?" জিজ্ঞাসা করিল।

"না, আমাদের এখন আর কোন কিছুই দরকার নাই, তোমরা খাও গিয়ে যাও," বলিয়া উকিল সাহেব উহাকে বিদায় দিলেন। প্রভুর মুখের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া, টেবিল হইতে বর্ত্তনাদি উঠাইয়া লইয়া আবদুল খানশামা নীচে নামিয়া গেল।

অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রামের পর উভয়ে উঠিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় জাফর আসিয়া সংবাদ দিল "হুজুর গাড়ী আগেয়া।"

নামিয়া আসিয়া দুই বন্ধুতে গাড়ীতে উঠিলেন। অশ্বযান তীর-বেগে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। টিকিট কিনিবার তাড়া ছিল না। ডাক্তার সাহেবের রিটার্ণ টিকিট করা ছিল।

হোম সিগ্‌নাল পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে এক ভীমকায় মহাদৈত্য বিশ্রাম ভঙ্গের ব্যথা পাইয়া, ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, একমুখ ধূম্র উদ্গিরণ করিতে করিতে, "এই ছিল গেল কোথা, পালাইয়ে যাবে কোথা?" প্রভৃতি নানারূপ শব্দে দিগন্তর কাঁপাইয়া, প্রকাণ্ড দেহ লইয়া প্লাটফরম সন্নিধানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাড়াতাড়ি যে যার তল্পিতল্পা লইয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিল।

বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া ডাক্তার সাহেব, "আমি শীঘ্রই ডাকে ফটো পাঠাইয়া দিব, সঙ্গে সঙ্গে যেন উত্তরটা পাই" বলিতে বলিতে, ট্রেনের একটি উচ্চ শ্রেণীর কম্পাটমেণ্টের দরজার হাতোল ঘুরাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল ও পুনঃ পুনঃ অস্পষ্ট শব্দ করিতে করিতে ষ্টেশনের সীমার, ও ক্রমশঃ প্লাটফরমের লোকগণের, এবং আমাদের উকিল সাহেবের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল।

তখনও আনওয়ার আলি কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া হস্তস্থিত রুমাল নাড়িতেছেন। তৎপরে একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া প্লাটফরমের নিম্নে ষ্টেশন রোডে রক্ষিত নিজ অশ্বযানে উঠিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আহম্মদ হোসেন চলিয়া যাইবার পর, এক সপ্তাহ গত হইতে চলিল, কিন্তু ফটো আসিয়া পৌঁছিল না। এই সাতটা দিনের এক একটা দিন, আনওয়ারের নিকট এক একটা মাসের চে'য়েও বেশী বলিয়া বোধ হইতেছিল।

অনিদ্রা ও বিষাদের রাত্রে গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিলেও শীঘ্র যাইতে চাহে না। আবার সুনিদ্রা ও সুখের রজনী হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিলেও তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া দৌড়িয়া প্রস্থান করে।

সকালে উঠিয়া উপাসনান্তে উকিল সাহেবের এখন প্রথম অনুমতি হইত বেচারা খানশামার উপর। "যাও ডাকঘরে, গিয়ে দেখে এস কোন চিঠিপত্র আছে কি না," এব আজ কাল আব্দুল খানশামার প্রতি ইহাই প্রত্যাহিক প্রাতঃকালীন আদেশ ছিল।

আব্দুল বেচারাও উঠিয়াই তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত পোষ্ট আফিসে গিয়া, জানালায় মুখ বাড়াইয়া "উকিল সাহেবের নামের চিঠি থাকে দিন" বলিয়া পিয়নগণের বাছাই কার্য্যে একটু বিঘ্ন ঘটাইত। কোন কোন দিন ডাক এডিসনের একটা

স্বপ্নদৃষ্টা

অমৃত বাজার পত্রিকার সহিত মক্কেলের লেখা মামলা সম্বন্ধীয় দুই এক-খানা জরুরী পত্র লইয়া ফিরিয়া আসিত। আবার কোন দিন কেবল সংবাদ পত্র খানি হাতে বাবুর অফিস ঘরে সভয়ে প্রবেশ করিয়া, টেবিলের উপর তাঁহার এখনকার সম্পূর্ণ অদরকারি জিনিষগুলি, বহুমূল্যবানীয় স্থানে অতি সন্তর্পণে রাখিয়া দিত।

আনওয়ার তাহার মধ্যে কোন কোনটির দুই এক ছত্রে চোখ বুলাইতেন। কখনও বা শিরনামার উপরটায় একবার চক্ষু ফিরাইয়া, যথা স্থানে রাখিয়া ম্লানমুখে সরিয়া পড়িতেন, ও পত্রগুলি মুহুরীকে দিতে বলিতেন।

এইরূপে পূর্ণ দুই সপ্তাহ অতীত হইবার পর, একদিন খানশামা দুই তিন খানা টিকিট মারা একটা বড় গোছের খাম, এবং সহি লইবার জন্য, এক টুকরা জরদ রংয়ের ছাপান কাগজ, উকিল বাবুর হাতে দিয়া "এই হলদে কাগজটিতে সহি লইয়া এখনই ফিরাইয়া দিয়া আসিতে হইবে" বলিয়া টেবিলের উপরিস্থ স্বর্ণনিব সংযুক্ত প্রাস্রবণীক লেখনীটী আনওয়ার আলি সাহেবের হস্তে দিল।

উকিল সাহেব টিকিটের উপর পাণ্ডুয়া, জেলা হুগলীর ছাপ মারা ডাক মোহর দেখিয়া, ইহা তাঁহার প্রিয় বন্ধু আহম্মদ হোসেন সাহে-বের প্রেরিত, হৃদয়ঙ্গম করিলেন ও আনন্দে বিভোর হইয়া হস্তস্থিত কলম দ্বারা হলদে কাগজটিতে নিজ নাম দস্তখৎ করিয়াই, তারিখ বসাইবার স্থানে কলম স্থাপন পূর্ব্বক উর্দ্ধ দৃষ্টিতে "আজ হ'ল" উচ্চারণ করিলেন।

আব্দুল খানশামা সামান্য লেখা পড়া জানিত, সে তৎক্ষণাৎ মুনিব

যে তারিখ জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন বুঝিয়া, অসাবধানে "১৭ই সেপ্টেম্বর" বলিয়া ফেলিল।

অবাদুল দেখিল তাহার তারিখ বলায় উকিল সাহেব বরং সন্তুষ্ট-ভাবাপন্ন হইয়া তাড়াতাড়ি তারিখের যায়গায় কি লিখিয়া কাগজ খানি তাহার হস্তে দিলেন ও ডাক ঘরে ফেরৎ দিয়া আসিতে বলিলেন।

চতুর আব্দুল অনুমানে, তাহার অবস্থান, মুনিব যে আর তখন চাহিতেছেন না বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ রসিদ খানি হাত বাড়াইয়া লইয়া সরিয়া পড়িল।

আনওয়ার আলি লেফাফাখানি উঁচু করিয়া আলোর দিকে ধরিয়া তাহার একটা পাশ ছিঁড়িলেন। খামের ভিতর হইতে দুদিকে দুখানা শক্ত মোটা কাগজে মোড়া, সোনালি বর্ডার দেওয়া এবং সদর পৃষ্ঠায় পাতলা টিশু কাগজ লাগান, একখানি সুন্দর পিষবোর্ড বাহির হইল।

উপরিস্থ পাতলা কাগজের আবরণটি সরাইবামাত্র, আনওয়ার আলির মুখ হইতে, অজ্ঞাতসারে, "এই সেই মুখ খানি" শব্দ বাহির হইয়া পড়িল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

ফটোগ্রূপের মধ্যে একখানি কেদারায় একটি প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রৌঢ়, ও তৎপার্শ্বে ঈষৎ নিম্ন একখানি ছোট চৌকিতে উপবিষ্টা একজন অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া। মূর্ত্তি দুইটী দেখিলেই প্রাণে প্রগাঢ় ভক্তি রসের উদ্রেক হয়।

এতদুভয়ের পার্শ্বে ঈষৎ ঘোমটায় ঢাকা দুই জন সুন্দরী নবীনা দণ্ডায়মানা।

নবীনাদ্বয় সামান্য লজ্জাবনতবদনা হইলেও, আনওয়ার আলি অনুভব করিতে লাগিলেন, যেন মৃগনয়নাদ্বয় তাহাদের পটলচেরা সুগঠিত চক্ষুদ্বারা তাহাকেই দেখিতেছে। আনওয়ারের চক্ষেও যেন কে লজ্জার আবরণ চাপা দিল। কে যেন চুপি চুপি আনওয়ারকে বলিল "কি করিতেছ, ঐ বাম দিকে দণ্ডায়মানা যুবতীটীকে তুমি জান? ও যে তোমার প্রিয় সুহৃদ ডাক্তার আহম্মদ হোসেনের অর্দ্ধাঙ্গিনী। ছি! পরস্ত্রী; বিশেষতঃ বন্ধুর স্ত্রীর দিকে ওরকম নির্লজ্জভাবে চাহিতে আছে?"

আনওয়ার আলির চমক ভাঙ্গিল। মনে হইল ঠিক ত', ডাক্তার

এই অবস্থায় আমাকে দেখিলে হয়ত কি মনে করিবে। আবার সেই সঙ্গেই স্বপ্নদৃষ্টা সুন্দরীর কথা স্মরণ হওয়ায়, আনওয়ার আলি এক দৃষ্টে নির্নিমেষ লোচনে দক্ষিণ পার্শ্বস্থিতা নবীনার অনিন্দ্য সুন্দর বদন কমল একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আনওয়ার তুমি পাগল হ'লে না কি? জীবনবিহীন তছবিরের দিকে অমন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছ কেন? আবার মধ্যে মধ্যে অমন বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাসই বা ফেলিতেছ কেন? তুমি দক্ষিণে স্থাপিতা বালিকাকে চেন? ও যে প্রৌঢ়া দ্বয়ের স্নেহের ও আদরের কন্যা রশীদা।

তুমি ও কি ক'র্‌ছ আনওয়ার? তোমার চক্ষে জল আসিল কেন? আবার ওকি হচ্ছে, ফটোটি ক্রমশঃ মুখের কাছে আনিতেছ যে? ওহ! ভাল ক'রে দে'খবে বলে বুঝি ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আ'নছ? তোমার ওষ্ঠাধরও কি দে'খতে পায় নাকি? না আনওয়ার তুমি অন্যায় কাজ কল্লে।

তুমি বয়সে প্রবীণ না হইলেও, বুদ্ধি বিদ্যায় তুমি একজন মহা-প্রবীণ বলিয়া খ্যাত। ফটো দেখিতে দেখিতে এ আবার কি তোমার নূতন উপসর্গ। বুঝেচি এই দক্ষিণে দণ্ডয়মানা বালিকাই তোমার স্বপ্ন-দৃষ্টা, স্বপ্নরাণী।

আনওয়ার আলি ফটো খানি কাগজে মুড়িয়া শয্যাস্থ উপাধানের নীচে রাখিয়া, পত্র লিখিতে বসিলেন। পাঁচ সাত মিনিটে পত্র লেখা শেষ হইল। আনওয়ার লিখিলেন —

ভাই ডাক্তার —

আমার আন্তরিক শত সহস্র ধন্যবাদ গ্রহণ করিবে। তুমি যে

স্বপ্নদৃষ্টা

রত্নের প্রতিকৃতি আমাকে উপহার দিয়াছ, উহা যে সে রত্ন নহে।

স্বপ্নে এই রত্ন দর্শন করিয়াই আমি পাগল হইয়া [illegible]
রত্ন লাভের জন্যই আমার কঠিন প্রতিজ্ঞা।

আমার নিশার স্বপন, সাধনার ধন, এ অমূল্য রত্ন তুমি কোথায় পাইলে ভাই?

কোন্ যাদু বলে বা কৌশলে, তুমি আমার স্বপ্নমণিকে আবিষ্কার করিয়াছ? ইহার বিনিময়ে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ ছাড়া আর আমার তোমাকে দিবার কি আছে?

বলিতে পারি না এ অমূল্য রত্ন ভোগসুখ আমার ন্যায় হতভাগ্যের কপালে আছে কি না।

না না এ অমুল্য নিধি আমারই। যদি আমারই না হইবে, তবে আল্লাহ পাক এ রতন আমাকে স্বপ্নে দেখা'বে কেন? আমার স্বপ্ন যে সত্য, আমাকে তাহা এত শীঘ্র জানিয়ে দেওয়ায়, তোমাকে ভাই কি বলে আশীর্ব্বাদ ক'রব তাহা খুঁজে পাচ্চি না।

একটু পেয়েছি ভাই, আমি বয়সে তোমার বড়, তাই বলছি, তুমি সস্ত্রীক চিরসুখী ও দীর্ঘজিবী হও। তোমাদের গোটা দুই তিন সুন্দর সুন্দর ফুট ফুটে ছেলে মেয়ে হউক। আর তোমার আনওয়ারের বিরহ যন্ত্রণা শীঘ্র দুর কর। এর বাড়া আশীর্ব্বাদ আর আমি জানি না।

বাড়ীর সকলকে শ্রেণী মত আমার আদাব ও দোয়া জানাইবে। নিজ ও সকলের কুশল দানে সন্তুষ্ট করিবে ইতি—

তোমার আনওয়ার

প্রথম অংশ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অংশ

——:o:——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

——:o:——

ঊষার অন্ধকার যায় যায় করিয়াও যাইতে পারিতেছে না; গাছের ঝোপে, গৃহের কোণে, বটের ছায়ায় এখনও জমাট বাঁধিয়া আছে। পবিত্র ঈশ্বর আরাধনার স্থান মছজেদ হইতে মধুর কণ্ঠে খোদা তায়ালার পবিত্র নাম উচ্চারণ হইতেছে ও মুসাল্লীগণ ঐ আহ্বান শ্রবণে অজু করিয়া দ্রুতপদে মছজেদ অভিমুখে নমাজ পড়িতে যাইতেছে। নীড় ত্যাগ করিয়া পক্ষিগণ শাখায় বসিয়া, মধুর স্বরে প্রভাতি গাহিয়া দয়াময়ের মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

এক সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী মুর্শিদাবাদ নগরের অনতি দূর-বর্ত্তী, নওয়াবপুর গ্রামের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তিশালী এবং ধনে মানে শ্রেষ্ঠ হাফেজ ফজলর রহমান সাহেবের বাগানে সাজি হস্তে উৎকল দেশ নিবাসী একজন বৃদ্ধ মালি পুষ্প চয়ন করিতেছিল। সহসা উদ্যান পার্শ্ববর্ত্তী পাকা রাস্তায় একখানি গরুর গাড়ীর হড় হড় শব্দে, সেই দিকে

দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায়, ও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর বাঁধা ছইয়ের অভ্যন্তর হইতে একজন ভদ্রলোককে বাহির হইতে দেখিয়া, মালি সাজি হস্তে লইয়াই ভদ্রলোকটিকে দেখিবার জন্য একটু অগ্রসর হইল।

হঠাৎ জামাই বাবুকে এরূপ অবস্থায় গরুরগাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া মালি একটু লজ্জিত ভাবে অতি কাতর কণ্ঠে বলিল, "আমরা কোন খবর পাইনি ত', বাবু কি কোন পত্র দেন নি? গরুর গাড়ীতে বড্ডই কষ্ট হয়েছে। একটু খবর পেলেই আমরা পালকি নিয়ে গিয়ে ষ্টেশনে হাজির থাকিতাম, আর ঘোড়ার গাড়ীর আস্তাবলও ত' ষ্টেশনের নিকটেই ছিল।"

শ্বশুর বাড়ীর বহু পুরাতন ভৃত্যের এইরূপ সরল, দুঃখিত ও কুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া, আগন্তুক বলিলেন "না হে আমার কোনই কষ্ট হয় নাই। রাত্রে যদিও ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী ছিল না, তত্রাচ এই গরুর গাড়ীর গাড়ওয়ানটি বেশ বেশী করে খড়পেতে, একটু নরম গোছের বিছানা করেই আমাকে নিয়ে এসেছে।"

এই বলিয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটি গাড়ীর একটু পার্শ্বের দিকে সরিয়া গিয়া মালিকে "তুমি ব্যাগ ট্যাগ গুলো বার ক'রে নাও" বলে নিজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মালিও প্রকাণ্ড ট্রাভলিং ব্যাগটি স্কন্ধে ও একটি দড়ি বাঁধা হাঁড়ি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে আরম্ভ করিল।

অনতিদূরেই হাফেজ সাহেবের সদর বাড়ী ও তৎসংলগ্ন প্রকাণ্ড বৈঠকখানা। হাফেজ সাহেব ফজরের নমাজ পড়িয়া, বৈঠকখানার খোলা রোয়াকের উপর তছবি হস্তে অজিফা পড়িতে পড়িতে, পায়চারি

করিতে ছিলেন। হঠাৎ পরিচিত স্বরে "মালি ব্যাগটা এখানে রেখে তুমি গাড়ওয়ানকে এই টাকা দুটো দিয়ে এসো" শুনেই হাফেজ সাহেব সেই দিকে ফিরিলেন ও জামাতাকে দেখিয়া "দামান্দ মিয়া এই অসময়ে খবর না দিয়ে কি রকমে এলেন?" বলিয়া স্ফটিকের তছবিটি মুঠার মধ্যে রাখিয়া ও আগন্তুকের আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া "পাগলা ছেলে, একখানা চিঠি লিখে খবর দিতে কি তোমার মা নিষেধ করেছিলেন? আমার ঘরে কি পালকি নেই! এই ভাড়াটে একখানা যাচ্ছেতাই গরুর গাড়ীতে এতখানি পথ এসে, বাবাজির কত কষ্টই হয়েছে। কেন ঘোড়ার গাড়ীও কি ষ্টেশনে ছিল না? তা বাবা তোমার যেমন কাজ" ইত্যাদি মধুর ভর্ৎসনা করিয়া, জামাই বাবুকে সঙ্গে লইয়া অন্দরের দিকে যাইতে যাইতে, "ওরে খেঁদি তোর মাজী কোথায়? দামান্দ মিয়া এসেছেন রে।" ইঙ্গিত বাক্যে স্ত্রীকে সরিয়া যাইবার উপদেশ বা সাবকাশ দিয়া আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া, যে ঘর খানি কন্যা জামাতার জন্য পৃথক ছিল, উপর তলায় তাহার দ্বার পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়া, নিজে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

বলা বাহুল্য আগন্তুক আমাদের পরিচিত ডাক্তার আহম্মদ হোসেন। আমরা জানি কোন বিশেষ দরকার না পড়িলে, ডাক্তার বিনা সংবাদে শ্বশুরালয়ে আসিবার পাত্রই নহেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনেক দিনের পর কোন খবর না দিয়া প্রবাসী স্বামী হঠাৎ বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে, সাধ্বী স্ত্রীর প্রাণে যে কি আনন্দ হয়, তাহা আমার পাঠিকা ভগ্নীগণকে আর বুঝাইতে হইবে না।

শ্বশুরের সঙ্গে আসিয়া ডাক্তার সাহেব যখন ঘরের মধ্যে ঢুকিবার প্রয়াস পাইতেছেন, সেই সময় তাঁহার স্ত্রী মোমেনা খাতুন নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া, জানালার দিকে মুখ করিয়া, একাগ্রচিত্তে একখানি কার্পেট বুনিবার নেটের উপর একটী আধফোটা মার্শেল নিলের অনুকরণে, জরদ রংয়ের উল দ্বারা একটী ফুল তুলিতে নিযুক্তা ছিলেন।

হঠাৎ পশ্চাতে কাহার পায়ের শব্দ শুনিয়া, যেমন কার্পেট হস্তে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে যাইবেন, অমনি পশ্চাৎ দিক হইতে দুই খানি হস্ত আসিয়া তাহার উভয় চক্ষু চাপিয়া ধরিল।

মোমেনা হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ভারি ত' বাহাদুরি, আমি যেন আর বুঝতে পারিনে; ছাড় ভাই রশীদা, কাজের সময় জ্বালাতন কল্লে ভাল লাগে না।"

তার পর জোর করিয়া হাত ধরিয়া ছাড়াইতে গিয়া দেখিল, হাতে ত' চুড়ি নাই; এ হাত ত' রশীদার নয়।

স্বপ্নদৃষ্টা

অলক্ষে কি জানি কেন একটা স্পর্শ সুখের হাওয়া মোমেনার দেহের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

বেশী কষ্ট দেওয়া ঠিক নয় ভাবিয়া, হাত দুখানি চক্ষু হইতে সরিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আহম্মদ হোসেন হাসি মুখে পত্নীর সম্মুখের দিকে চকিতে ঘুরিয়া গিয়া বলিলেন "গুড্ মরনিং মেম সাহেব।"

মোমেনা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া স্বামীর কদম বুছি করিল; তার পর মুখে আশ্চর্য্যের ভাব ফুটাইয়া বলিল "দিনের বেলা চাঁদের আলো দেখছি যে! আবার যেমন তেমন চাঁদ নয়, একেবারে পূর্ণচন্দ্র।"

এই সময় পাঠক পাঠিকার নিকট আমাকে একটু ক্ষমা চাহিতে হইল।

আমার বিবেচনায় কৌতুহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে, নিঃস্বার্থভাবে, অন্যের ঘরওয়া কথা আড়ি পাতিয়া শুনিলে বোধ হয় ততটা দোষ না হইতেও পারে। আর দোষ হইলেও নাচার। আমি ডাক্তার দম্পতীর কথাবার্ত্তা শুনিবার কৌতুহল কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিতেছি না।

পাঠক, আপনি একটু স্থানান্তরে যান, আমি ততক্ষণ আমার স্ত্রীলোক সুলভ কুতুহল নিবারণার্থে জানালার ফাঁক দিয়া ইহাদের কথা-বার্ত্তা শুনি। ভগিনী পাঠিকা, দ্বার জানালার ফাঁকে কান পাতিয়া, নবদম্পতীর প্রেমালাপ আপনি ত' ইতিপূর্ব্বে অনেকবার শুনিয়াছেন; আর একবার আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মোমেনার তাহার স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ শুনুন।

স্বপ্নদৃষ্টা

আহম্মদ হোসেন পত্নীর উপরোক্ত রসভরা কথা শুনিয়াই ঘোমটাটি সরাইয়া, তাহার কপোলে চুম্বন চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "অর্থাৎ কি না সময়ের জিনিষ অপেক্ষা অসময়ের জিনিষের কদর অনেক বেশী, বুঝলে? রাতে ত' চাঁদের আলো লোকে পে'য়েই থাকে।"

এইরূপ স্বামী স্ত্রীর হাসি গল্প, হাত কাড়াকাড়ি প্রভৃতিতে, প্রায় একঘণ্টা কাটিয়া গেল। আরও যে কতক্ষণ যাইত বলা যায় না, এমন সময় ঝি আসিয়া সংবাদ দিল "জামাই বাবুর নাস্তা তৈয়ার, মা শীঘ্র চা খাইতে ও নাস্তা করিতে বলিতেছেন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—— :*: ——

সদ্য প্রস্তুত নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী লইয়া, পত্নী মোমেনা খাতুন, যখন সহাস্যে পতিকে আহার করিতে অনুরোধ করিল, গম্ভীর বদনে স্বামী তখন উত্তর করিলেন, "আমার আদৌ ক্ষিদে নেই।"

প্রেমময়ী পত্নী ভয়ে ব্যস্ত ভাবে স্বামীর আরও নিকটে আসিয়া ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "সে কি ক্ষুধা নাই কেন? শরীর ভাল ত'? শীঘ্র বল, তোমার মুখ দেখে আমার মন কেমন ক'চ্ছে।"

পত্নীর সরল ভালবাসায় ডাক্তার মুগ্ধ হইলেন, এবং ব্যস্ততা দেখিয়া না হাসিয়াও থাকিতে পারিলেন না।

পরে কৃত্রিম বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "আহা! স্বামী আর ত' কা'রও হয় না, কেবল তোমারই একা হ'য়েছে, তাই ক্ষিদে নেই শুনে, ভেবেই সারা হ'য়ে গেলে। তোমার মত রক্ষা কবচ যার সঙ্গে আছে, তাহার নিকট অসুক বিসুক ঘেঁসতেই সাহস করে না।"

মোমেনাও কৃত্রিম অভিমান ভরে, সুচারু বিম্বাধর ফুলাইয়া বলিলেন, "আমার এই সবে মাত্র অন্ধের যষ্টি, ভয় হবেনা? একটু চোখের অন্তর হ'লে, দশ দিক শূন্য দেখি। তোমাদের পুরুষ জাতির মত হ'তে

পাত্তাম তা হলে কি আর ভয় হ'ত। একটা নয় দুটো নয়, এক সঙ্গে চার চারটে, দুটো হয়তো কায কর্ম্মে জোড়া থাকে, আর এক জোড়া কাছে কাছে থাকে, অন্ততঃ একটিও কাছে বসে থাকে। স্ত্রী বিয়োগের অভাব ত আর তোমাদের জাতির পেতে হয় না।"

ডাক্তার সাহেব তাঁহার স্বভাব সুলভ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং হাসিতে হাসিতে পত্নীর উদ্দেশে হাসিময় কণ্ঠে বলিলেন। "সালাম আলায়কোম বেগম সাহেবা, এ আকাট মূর্খ বান্দা কোন দিনই মহাশয়ার সঙ্গে কথায় এঁটে উঠ্‌তে পারেনিই, আজি বা পা'রবে কেন? ধিক্‌ ভাই তোমার স্বাস্বীকে।"

মোমেনা হাস্য উজ্জ্বল মুখে জোর করিয়া গাম্ভীর্য্য টানিয়া আনিয়া, অনুমতির সুরে বলিলেন, "এখন যে বেচারাগুলো প্রস্তুত হ'য়ে পেট কুঠারিতে যা'বার জন্য পড়ে অপেক্ষা করছে, তাদেরকে সেই পথে অগ্রসর করে দিয়ে একটা থ্যাঙ্ক গ্রহণ কর।"

এই সময় ঝি চায়ের সরঞ্জাম তথায় স্থাপন করিয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

ডাক্তারের চক্ষু এখনও স্ত্রীর সুন্দর মুখটির উপর স্থাপিত দেখিয়া, মোমেনা বলিল, আচ্ছা আমার উপর নজর একটু পরে রাখিলেও চলিবে আমিত নজরবন্দি আছিই। চায়ের দিকে দয়া করিয়া নজরটা একটু করে দেখ, চা জু'ড়য়ে গেল যে। তামাসা নয় ভাই, তুমি এখনও নাস্তা করনি শুনলে আম্মাজান কি মনে করবেন, আমাকেই বকা ঝকা করবেন।"

ডাক্তার সাহেব তখন ধীর দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "রশীদাকে ডেকে

আন তবে নাস্তা করব ; সে না এলে আমি কিছুই খাব না।"

রশীদা খাতুন মোমেনার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট, এবং পিতা মাতার এই কনিষ্ঠ সন্তান। রশীদা বড়ই লজ্জাশীলা. জ্যেষ্ঠের বিবাহের পর একবার মাত্র ভগ্নীপতীর সমক্ষে আসিয়াছিল, তাহাও স্বইচ্ছায় নয়।

যাহা হউক স্বামীর ভাব গতিক দেখিয়া অগত্যা মোমেনা ধীর পদবিক্ষেপে নীচে নামিয়া গেল। ও কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "রশীদা বলে দামন্দ ভাইকে আমার আদাব বল, আর বলো আমার যেতে কোন বাধা নাই তবে বড্ড লজ্জা করে।"

হঠাৎ স্বামার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় মোমেনা অবাক হইয়া গেল। দেখিল তাঁহার মুখ ভয়ানক গম্ভীর এবং ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আর একবার স্বামীর গাম্ভীর্য্য মাখা মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া মোমেনা খাতুন বলিল "বলি সে এলনা বলে তুমি কি খাবেনা? আজ আবার নূতন খেয়াল হ'ল কেন? পূর্ব্ব থেকে ওরকম জিদ ক'ল্লে এত দিনে তার লজ্জা ভেঙ্গে যেত, তা ত' করনি।"

এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলে ফেলে মোমেনা স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং দেখিলেন, ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন প্রশান্ত ভাব ধারণ করে. ডাক্তার সাহেবের চির হাস্যোৎফুল্ল মুখখানা সেইরূপ প্রশান্ত দেখাইতেছিল। তাঁহার তদানীন্তন মুখের ভাব দেখিয়া মোমেনার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। এই অবস্থায়ও প্রেমময়ী মোমেনা সুন্দরী মনে মনে ভাবিল যাহাই হউক না কেন, ইনি ত আমার উত্তম অর্দ্ধাঙ্গ।

এই প্রকারে মনকে প্রবোধ দিয়া, দ্রুতবেগে স্বামির নিকটবর্ত্তী হইয়া হঠাৎ তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মোমেনা নির্লজ্জ ভাবে ডাক্তার সাহেবের গণ্ডে মধুর চুম্বন রেখা অঙ্কিত করিয়া দিলেন, এবং বলিলেন, "প্রভো, স্বামিন্ তুমি রাগ করে ? ছি ! ছি ! ছেলেমানুষ সে ; সে তোমার ছোট শ্যালী, ভগ্নি ও ছোট শ্যালিতে তফাৎ আছে কি ?"

ডাক্তার সাহেব অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "এ যাবৎ আমি কখনও ভাবি নাই, যে আমার ভাই বা ভগ্নী নাই। বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত তোমার ভাই ভগ্নীকে আমি আমার নিজ সহোদর সহোদরা মনে করি, এবং সেই চক্ষেই তাহাদিগকে বরাবর দেখিয়া আসিতেছি। তোমরাই আমাকে পর ভাব, হয়ত কোথা[illegible]র একটা কে মিন্‌সে মনে কর। আর এক কথা আমি রাগই বা করব কেন, আমার রাগে কার কি আসে যায় ?"

ডাক্তার সাহেবের "রাগই বা ক'রব কেন" ইত্যাদি শেষোক্ত কথায় মোমেনা স্বামীর রাগের বহরটা বেশ বুঝিয়া লইল, এবং স্পষ্ট বুঝিল যে রশীদার সামে না আসাই, এই রাগের উৎপত্তি ও কারণ।

তখন মোমেনা, স্বামীর প্রশস্ত ললাট হইতে তাঁহার চূর্ণীকৃত চুলগুলি নিজ চম্পক অঙ্গুলিদ্বারা সরাইয়া দিতে দিতে, স্বামীর অত্যন্ত ঘর্ম্মোদ্রেক হইতেছে অনুভব করিয়া, নিকটস্থ পাখা লইয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে পুনরায় খাইবার জন্য অনুরোধ করায়, ডাক্তার সাহেব একটু নম্র সুরে "ক্ষিদে হ'লে খাব এখন" বলিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন ও মোমেনার হস্ত হইতে একটু জোর করিয়াই পাখা খানা লইয়া, নিজে জোরে জোরে চালাইতে

লাগিলেন ও পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়াও যখন স্বামীর কোন সাড়া পাইলনা, তখন মোমেনা. "যাঁ'দের জামাই তাঁরা দেখে নি'ন্ গিয়ে, আমি আর বকতে পারি নে।" বলিতে বলিতে নামিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

এদিকে ডাক্তার শুইয়া পড়িয়া পত্নীর ব্যথিত কণ্ঠের নিস্থত বাক্য কয়টী, মনে মনে উচ্চারণ করিয়া কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। এবং কিসের জন্য এই লুকোচুরি খেলা, তাহা সরলা বালিকাকে একাল পর্য্যন্ত খুলিয়া বলিতে না পারায় প্রাণে দারুণ অশান্তি অনুভব করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার সাহেবের পূর্ব্ব ভাব অধিকক্ষণ থাকিল না। কি মনে করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কি মধুর কথা "যা'দের জামাই তারা দেখে নি'ন্ গিয়ে।"

এমন সময় দোরের বাহিরে অন্ততঃ দুই জোড়া পায়ের থষ থষ শব্দ ও তৎসঙ্গে মন ভোলান মধুর সুরে ' তোর লজ্জার জ্বালায় গেলুম, উনি তোর বড় ভায়ের মত, ওঁর কাছে আবার লজ্জা" শুনিয়াই, ডাক্তার কৃত্রিম নিদ্রার ভান করিয়া, তাড়াতাড়ি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক একটু নাসিকা গর্জ্জনের অভিনয় আরম্ভ করিলেন।

মোমেনা রশীদার হাত ধরিয়া জোরে স্প্রীংয়ের কপাট খানি খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া বলিল "দেখ্ দেখি এতটা বেলা হয়েছে তবুও নাস্তা করেন নি'। তুই কি ভাই ?"

রশীদা ঘরের মধ্যে দুই চারি পা আসিয়াই জড়সড় হইয়া থপ করিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

এই সময় মোমেনা স্বামীর গায়ে ঈষৎ জোরে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল "আর ঘুমিয়ে কাজ নেই, উঠে কে এসেছে দেখ; দেরি কল্লে

উপে যা'বে। এ আমাদের মত রক্ত মাংসের শরীর নয়. এ খাঁটি কর্পূর দিয়া তৈরী।"

ব্যস্ত ভাব চাপিয়া আলস্য ত্যাগে ডাক্তার সাহেব উঠিয়া বসিলেন ও চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিলেন "কে কে এসেছে নাকি? খালি চালাকি।"

"চালাকি আবার কি; দেখ্তে পাচ্চ না? রনীদা, বোন্ উঠে তোর দামান্দ ভায়ের চক্ষু দুটো বেশ করে রগ্ড়ে দে'ত, ঘুমটা কেটে যা'ক" তার পর "বলি তোমার কি এরি মধ্যে চাল্‌সে ধ'ল্ল নাকি?" বলিয়া মোমেনা ঘরের সমস্ত জানালা গুলি খুলিয়া দিয়া "এইবার দেখ্তে পেয়েছ, না চশমা এনে দিব?" বলিল।

ডাক্তার হাসিয়া বলিল, "তাইত আমি কানা নাকি, মেঝের উপর অত বড় একটা কাপড়ের পুটলি পড়ে রয়েছে আর আমি দেখ্তে পাইনি।"

মোমেনা নিজ উজ্জ্বল হাসিভরা নয়ন যুগল স্বামীর মুখের উপর নিঃক্ষেপ করিয়া বলিল " তাই ব'লে ওটা একটা ধোপার বাড়ী দিবার ময়লা কাপড় বাঁধা পুটলি নয়; বেশ সুন্দর জ্যান্ত পুটলি। ও পুটলি হাসে কথা কয়, আবার চ'লেও বেড়ায়। না বিশ্বাস হয় একবার নেড়ে চেড়েই দেখ না।"

ডাক্তার কৃত্রিম বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "তাই নাকি? তবেত ভাল। ওহ! এটাযে দেখ্চি কচ্ছুবে পুটলি, ভিতর থেকে একটু হাত পা মত যে বেরচ্চে দেখ্চি। পুটলিটীর নাম কি? কৈ একবার হাসতে ও দুটো কথা কইতে বল দেখি শুনি।"

স্বপ্নদৃষ্টা

মোমেনা আস্তে আস্তে নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া, চুপি চুপি হাত বাড়াইয়া, খপ ক'রে রশীদার ঘোমটাটা খুলে দিল।

এক পসলা বৃষ্টিজলে সন্ত ধোয়া আধ ফোটা পল্‌নিরো গোলাপের কুড়িটীর মত মুখ খানি, আবার তাহার উপর মৃদু হাস্য রেখা। ডাক্তার সাহেব বিস্ময়ে ও পুলকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া, এই বালিকার অপরূপ রূপ মাধুরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

একদৃষ্টে অনেকক্ষণ দেখিতে দেখিতে ডাক্তার তন্ময় হইয়া যেন আড়ষ্ট ভাবাপন্ন হইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অন্যমনস্ক ভাবে অস্পষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ইহা সত্য, বা উকিল সাহেবের দেখার ন্যায় স্বপ্ন।"

মোমেনা স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন কি একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও তৃপ্তির ঢেউ স্বামীর মুখ-খানির উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

এক মূহুর্ত্ত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া স্মিতমুখে বলিলেন "কেমন, দেখার সাধ মিটেছে ত'? এইবার খাওয়ার আস্বাদনটা লওয়া হউক।"

"সেটা আর বাকী থাক্‌তে পেলে কৈ? একজন টান ধ'রেছে, আবার তুমিও ঠেলে ধ'রেছ। আমি একা, কাজে কাজেই আর কত-ক্ষণ যুঝ্‌তে পার্‌ব?" বলিয়া পত্নীর মুখের দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টি ফেলিয়া ডাক্তার হাসিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

——o——
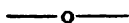
দ্বিপ্রহরে আহারাদি সমাপ্তির পর মোমেনা দ্বিতলস্থ নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ডাক্তার দ্বারের দিকে মুখ করিয়া শয্যায় শায়ীত অবস্থায় যেন তাহারই আশা পথ চাহিয়া আছেন।

মোমেনা হাসি মুখে ঘরে পা দিয়াই স্বামীর মুখাবলোকন করিতেই, তাহার সহাস্য বদন অজ্ঞাতসারে গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিন্তু গাম্ভীর্য্য চাপা দিয়া মুখে অনন্দের ভাব আনয়ন পুর্ব্বক, মোমেনা বলিলেন, "আমি তোমার কি চুরি ক'রে'ছি যে, দুয়ারের কাছে এক জোড়া প্রহরী নিযুক্ত ক'রে রেখেছ?"

ডাক্তার সাহেব স্ত্রীর বাকচাতুর্য্য শুনিয়া, আনন্দে অধীর হইয়া তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিলেন ও দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গাঢ় স্বরে বলিলেন, "কি চুরি করেছ জাননা, চুরি করে অবার এত তেজ। মন চুরি, প্রাণ চুরি, দেহ চুরি, বুদ্ধি চুরি, শেষ ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত চুরি করে, আবার বলা হচ্চে কি চুরি করেছি। চুরি করেও তোমার এত তেজ! সুধু চুরি নয়, ডাকাতি। নিজে চুরি ডাকাতি করেও ক্ষান্ত হও নাই। এখন দেখছি বোন টাকেও ঐ ব্যবসায় তালিম ক'চ্ছ।

তুমি কর দিনে, আর সে করে রাতে।"

তোমার চুরির শাস্তি এখনই দিব, আর তোমার বোনের শাস্তি পেতে একটু বিলম্ব হ'বে। কারণ, যা'র চুরি করেছে সে বেচারা এখনও চোরের সন্ধান পায় নাই।

"বটে" বলিয়া মোমেনা অগ্রসর হ'য়ে, গললগ্নঅঞ্চল হইয়া স্বামীর পায়ের তলে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল ও বলিল—

"শাস্তি নে'বার জন্য দোষী হুজুরে হাজির, অনুগ্রহ করে সেটা দিয়ে ফেলুন, দেরি করবেন না, আবার রাগ প'ড়ে গেলে সাজার পরিমাণটা কম হ'য়ে আসবে।"

ডাক্তার তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া, দুই বাহু বন্ধনে চোরকে কঠিন ভাবে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত অধরে অজস্র চুম্বন বর্ষণে, চুরির দাদ তুলিয়া লইলেন।

মোমেনা ব্যগ্রভাবে যত বারই কথা বলিতে প্রয়াস পাইল, ডাক্তারের চুম্বন তত বারই তাহাতে বাধা দিল।

শেষে বেচারি মোমেনা জোর করিয়া স্বামীর বাহুপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া, দু'পা পেছনে হটিয়া বলিল "বেশ. চুরি ক'রে যে এইরূপ অপমানিত হ'তে ও এত কঠিন শাস্তি ভোগ কর্ত্তে হয়, তা জা'নলে, আমি তোমার জিনিষ চুরি করা দূরের কথা, কখনই তোমার কোন দ্রব্যে হাত পর্য্যন্ত দিতাম না।"

মোমেনার মিলিটারি কেতায় দাড়াইবার ও উপরোক্ত কথাগুলি বলিবার ভাব দেখিয়া ডাক্তার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

স্বপ্নদৃষ্টা

এই দুই যুবক যুবতীর খোলা প্রাণে মধুর হাস্যে শরতের অলস মধ্যাহ্নও যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দশটা, হাফেজ সাহেবের বাটীর সম্মুখস্থ প্রশস্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া এখনও দস্তুরমত লোক যাতায়াত করিতেছে। গাড়ী ঘোড়াও এখন' বন্ধ হয় নাই। কেহ কেহ ভয় প্রযুক্তই হউক বা একটু আনন্দেই হউক, দ্রুতপদে রাস্তা বহিয়া যাইতে যাইতে একটু চাপা গলায় —

"ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার, চৌদিকে মালঞ্চ বেড়া।
ভ্রমর আদি গুন্‌গুন্ করে, কোকিলেতে দিচ্চে —"

ইত্যাদি বলিয়া সেই বহু পুরাতন বিদ্যাসুন্দরের টপ্পা আবৃত্তি করিয়া, সুরটি আগের অপেক্ষা ক্রমশঃ ভাল হ'চ্চে বিবেচনায়, পুলকে আরও দ্রুতপদে পথ হাঁটিতেছে।

ক্বচিৎ এক আধখানি কঙ্কালসার ঘোড়ার ছেক্‌ড়া গাড়ীতে, ষ্টেশন হইতে ভিতরে ছোট বড় পাঁচটী ও উপরেও অন্ততঃ তিনটী আরোহী লইয়া, কোচওয়ান কাষ্ঠনির্ম্মিত পা'দানিতে পা ঘষিতে ঘষিতে ও ঠুকিতে ঠুকিতে এবং চাবুকটি উঁচু করিয়া, হেই-হেই শব্দের সহিত নিরীহ ঘোড়া দুইটীর পার্শ্বদেশে সপাৎ সপাৎ শব্দে আঘাত করিতে

করিতে, সম্মুখস্থ বোঝাই গরুর গাড়ীগুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে কৃতকার্য্য হইতেছে।

আবার হয়ত' রাগে অধিক নাড়ানাড়িতে, পুরাতন রজ্জুনির্ম্মিত রাশ ছিঁড়িয়া যাওয়ায়, কোচম্যান বেচারা অনিচ্ছুক ভাবে কোচবাক্স হইতে অবতরণ করিয়া, ঐ ছিন্ন লাগামটি মেরামৎ করিতে থাকায় গরুর গাড়ীগুলো এগিয়ে পড়িল। তখন কোচওয়ানের আর রাগ দেখে কে। তাড়াতাড়ি কোচবাক্সে উঠিয়াই, দণ্ডায়মান অবস্থায় চাবুকটার আগার দিকটা ধ'রে, মোটা গোড়া দিয়ে ঘোড়া দুটোকে গো বেড়ন আরম্ভ করে দিল।

ঘোড়া দুটোও প্রাণের মায়ায়, গাড়ীর সামে ও পশ্চাতে বাঁধা নিজেদের দানা খাবার এক জোড়া আধখানা কাটা টিনের ঝম ঝম শব্দের সহিত, নিজের লৌহ পাদুকা পরিহিত পায়ের খট খট শব্দ মিলাইয়া, মধ্যে মধ্যে পশ্চাতের পা ছুড়িতে ছুড়িতে সাধ্য মত প্রাণপণে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বোঝাই গরুর গাড়ী, তৈল চর্ব্বি বিহীন হইয়া পড়ায়, কোঁ্যএ, কোঁ্যএ শব্দে নিজের অভাব ও দুঃখ জানাইতে জানাইতে, আমিরি চালে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ অস্ফুট আর্ত্তনাদের সহিত, নিজের গলা মিলাইতে গিয়া হিন্দুস্থানী চালক, দেশওয়ালি স্বভাবসিদ্ধ কম্পিত গলায় —

"আরে মেরে ছেঁইয়া, দিনুয়া বহুত গেইলা বিত" গাহিতে গাহিতে, মহাজনের বোঝাই মালের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া, আকাশের নক্ষত্র গণিতে গণিতে চলিয়াছে।

স্বপ্নদৃষ্টা

আজ বিলেত ফেরতা, জমিদার পুত্র জামাতার মনোরঞ্জনার্থে হাফেজ সাহেবের বাড়ীতে, সমস্ত দিন ধরিয়া, নানাপ্রকারের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে; ও তদুপলক্ষে গ্রামের জনকয়েক আত্মীয় ও বন্ধু নিমন্ত্রিত হওয়ায়, ডাক্তার সাহেব নিমন্ত্রিত জনগণের সহিত, সদরের বৈঠকখানায় আহারে বসিয়া ছিলেন!

আমরা পূর্ব্বে যে সময়ের কথা উল্লেখ করিলাম, ডাক্তার সাহেব উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আহার শেষ করিয়া অন্দরে চলিয়া গিয়াছিলেন; ও পশ্চিমের একটী জানালা খুলিয়া দিয়া উহার পার্শ্বে অবস্থিত, মখমল-মণ্ডিত সোফায় অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় শুইয়া কি আকাশ পাতাল চিন্তায় নিমগ্ন আছেন।

সদা হাস্যমাখা মুখ খানিতে. আজ হঠাৎ মলিনতার ছাপ দেখিয়া, ব্যথিত হৃদয়ে শুক্ল অষ্টমীর চাঁদ জানালার গরাদের ফাঁক দিয়া ডাক্তার সাহেবের মুখের উপর আছড়িয়া পড়িল। অনেকক্ষণ ধরিয়া বেহায়া অভিসারিকার ন্যায়, নাড়াচাড়া ও অনুনয় বিনয়ের পরও যখন তাঁহার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির করিতে পারিল না; তখন ক্ষোভে ও লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া, অবনত মুখে পশ্চিম গগনের আড়ালে গা ঢাকা দিল।

সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছে, অনুমান করিয়া সরল প্রাণ সমীরণ ধীরে ধীরে ডাক্তারের মস্তকে বাতাস দিতে লাগিল; এবং উহার ব্যস্ততা দেখিয়া বাগানের নৈশ প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধা ও হাচ্‌নাহেনার মিশ্রিত গন্ধ পবন ভরে ছুটিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে কিঞ্চিৎ সৌরভ ছড়াইয়া গেল।

কিন্তু সকলই বৃথা। এত কাকুলি বিকুলি করিয়াও এত গুলির মধ্যে কেহই ধ্যান মগ্ন ডাক্তারের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইল না। তিন জনেই হার মানিল। শেষে পরামর্শ করিয়া মোমেনাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য দুর্দ্দান্ত যুবক বাতাসকে পাঠাইয়া দিল।

বায়ু রোষ ভরে, শোঁ শোঁ শব্দ করিতে করিতে মোমেনা খাতুনের নিকট যাইয়াই, চোখ রাঙ্গাইয়া, নিজ অস্ফুট স্বরে একবার মাত্র তাহাকে ডাকিতেই, মোমেনা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাড়াইল। এবং স্বামী একা আছেন ও ঝড় আসিতেছে, এখনই বিছানা পত্র ভিজিয়া যাইবে ভাবিয়া, দৌড়িয়া সিঁড়ি দিয়া উপর তলায় আসিল।

মোমেনা নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আহম্মদ হোসেনকে সোফার উপর নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া "বলি ঘুমুলে নাকি? আমার আসতে দেরি হয়েছে কি, কটা বা'জল?" বলিতে বলিতে ডাক্তার সাহেবের নিকটে আসিয়া গাত্র স্পর্শ করিতেই, তিনি স্বপ্নো-খিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন।

মোমেনা বলিল "ঘুমিয়ে পড়েছিলে? রাত ত' তত বেশী হয় নি, তুমি দহলিজ থেকে খেয়ে এসে চুপটি করে শুয়ে ছিলে, আমি ভা'বলাম, আমার আ'সতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, তুমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছ।"

আমি, রশীদা ও আম্মাজান একত্রে ব'সে ভাত খে'য়ে উঠ'বার পর, জামিরণ (ঝি) একটা কি কাজে উপরে এসে ছিল, সে নীচেয় গিয়ে বল্লে দামান্দ মিয়া চুপটি ক'রে এক দিকে ফিরে ঘুমুচ্চেন। আমি মনে কল্লাম তবে এই অবকাশে গোটা কত পান সেজে নিয়ে যাই। এই

তাই বসে পান সা'জছিলুম, এমন সময় বাতাসের ঝাপটা উপরের জানালায় ধাক্কা দিচ্চে শুনেই তাড়াতাড়ি করে চলে এসেছি।"

এই বলিয়া ঢাকার কারুকার্য্য খচিত, সুবাসিত পান সমেৎ একটি রজতময় ডিবা স্বামীর হাতে দিতে গিয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, মোমেনা চম্‌কিয়া উঠিল ; ও বলিল।

"কি হ'য়েছে, তোমার মুখ এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? শরীর ভাল ত'? বল, তোমার পায়ে পড়ি অমন করে থেকোনা, আমার প্রাণে বড় কষ্ট হয়। আমার উপর রাগ করেছ?"

ডাক্তার একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোমার উপর রাগ ক'রব কেন? কি দোষ তোমার। তোমার মত সর্ব্বগুণে গুণবতী স্ত্রীর উপর, যে হতভাগ্য স্বামী রাগ করে, তার বাঁচার চেয়ে মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত কথা বার্ত্তার পর ডাক্তার সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিলেন। তৎপরে মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া ডাক্তার বলিলেন "দেখ মুমি, আমি একটা কথা চিন্তা কর্‌চি।"

মোমেনা সাগ্রহকণ্ঠে প্রশ্ন করিল "কি কথা, তা আমায় ব'লবে না? বল্‌তে কোন কঠিন বাধা আছে কি?"

ডাক্তার কাতর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "প্রিয়ে তোমার মুখে এ কথা শু'নব আশা করি নাই। দুনিয়ায় এমন কোন গোপনীয় কথাই আমি খুজিয়া পাই না, যাহা তোমাকে বল্‌তে আমার বাধা থাক্‌তে পারে।"

মোমেনা লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া বলিল, "না না, আমি কি তাই বল্‌ছি, তবে কিনা এবার আসা পর্য্যন্ত এই দু'দিন থেকে, তোমাকে কেমন কেমন দেখ্‌চি। সর্ব্বদাই তুমি অন্যমনা। সকল সময়েই তুমি যেন কি একটা চিন্তা ক'র্‌চ; অথচ আমাকে দে'খলেই যেন থত মত খেয়ে যাও। তুমি ত' কোন কথাই আমাকে কখনও লুকোওনি। এবার তোমার মুখে 'যেন সর্ব্বক্ষণই কি একটা গোপন করার

স্বপ্নদৃষ্টা

ছবি আঁকা র'য়েছে।

দেখ, মুখ হ'চ্চে হৃদয়ের আরসী। মনে যে ভাবের উদয় হইবে ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রলে, মুখে ঠিক সেই ভাবটি প্রতিফলিত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাই ব'লছি, এবার তোমার মুখের ভাব দেখে, প্রথম থেকেই আমার অনুমান হ'চ্চে, তুমি যেন কি বল্‌ব বল্‌ব ক'রে, লজ্জার খাতিরেই হউক বা অপর কোন গুরুতর কারণেই হউক, আমাকে বল্‌তে পা'চ্চ না। আর এই গোপন করার জন্যই বাস্তবিক আমার মনে একটু, একটুই বা বলি কেন, বেশ অভিমান হওয়ায়, তোমাকে রাগ করেছি দেখাইবার জন্য ও রকম কথা বল্লুম।

তুমি বুঝি সত্যিই ভাব্‌লে"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সুন্দরী স্বামীর গা ঘেঁসিয়া ঐ সোফার উপর বসিয়া পড়িল ও তাঁহার বামহস্ত খানি নিজ উভয় হস্তের মধ্যে টানিয়া লইয়া, অনামিকাস্থিত, বিবাহ কালীন তাহারই পিতৃপ্রদত্ত মূল্যবান হীরক অঙ্গুরীটি ক্রীড়াচ্ছলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে, কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করিল, "তবে কি ভাব্‌চ আমাকে বল। না বল্লে কিন্তু—"

"কিন্তু কি, আড়ি? তা কতক্ষণের জন্য? জোর মিনিট খানিক, না বোধ হয় তার চেয়েও কম।" এই বলিয়াই ডাক্তার হাতটি সরাইয়া লইয়া তাহার আদরের মোমের পুতুলটিকে দুই বাহুদ্বারা বক্ষে টানিয়া লইলেন। এবং যে মুখটি দিয়া মোমেনা এতক্ষণ তাঁহার উপর এতগুলি মধুর গালি বর্ষণ করিতেছিল, শত শত চুম্বন—শিল দ্বারা, সেই খোলা মুখ, গালা মোহর করিয়া দিতে লাগিলেন।

মোমেনাও যে এতগুলি কঠিন চুম্বন পেঁল বুক পাতিয়া নীরবে

সহ্য করিয়াছিল তাহা নহে। সে বেচারি স্বামী অপেক্ষা ক্ষমতায় কম হইলেও, মধ্যে মধ্যে ফাঁক পে'লে, দুই চারিটির জবাব দিতে ছাড়ে নাই।

এইরূপ অবস্থায় অনেকক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর, মোমেনা আবার বলিল, "কৈ তুমি আমাকে বল্লে না? কেন তোমার এরূপ বৈরাগ্য ভাব, তাহা তুমি আমাকে খুলে বল্লেনা। আর কোন অভাগীই বা আমার কাঙ্গালের ধন, এ রত্নটিকে কাড়িয়া লইবার জন্য, তাহার মনে এরূপ বৈরাগ্য ভাব প্রবেশ করাইয়া দিল।"

শেষোক্ত কথাটি বলিয়াই, মোমেনা মুখ মুচ্‌কাইয়া হাসিল, ও হাসি চাপিবার ছলে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। ডাক্তার তাহার চিবুকটি আদরের সহিত ধরিয়া, মুখটি ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন।

"না না, ভয় নাই; কোন অভাগীই তোমার স্বামীটির মনে বৈরাগ্য আনয়ন করে নাই। এ একটা অভাগা।"

এমন সময় দেওয়ালস্থিত লম্বমান ঘড়িতে ট্যাং ট্যাং করিয়া বারটা বেজে গেল। ডাক্তার ঘড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "উহু! অনেক রাত্রি হ'য়েছে চল শুয়ে পড়া যা'ক্।"

"সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায়, উভয়ে ঘুমাইবার আশে শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু মোমেনা নাছোড়বান্দা; সে সেই সাবেক সুর বরং একটু চড়াইয়া ধরিল "কই বল্লে না কি হ'য়েছে?"

ডাক্তারও ঐ অবকাশ খুঁজিতে ছিলেন। প্রেমময়ী স্ত্রীরত্নকে বক্ষে ধারণ করিয়া, আনওয়ার আলি ঘটিত সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত তাহার নিকট পরিচয় করিতে লাগিলেন।

স্বপ্নদৃষ্ট।

স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া মোমেনার মন যেমন পুলকে পূরিয়া উঠিল, তৎসহ মৃতপত্নীক এবং সকল অপেক্ষা মৃতা স্ত্রী আবার একটি কন্যা উপহার দিয়া গিয়াছে শুনিয়া, প্রাণে অশান্তি বোধ করিতে লাগিল।

স্বামীর মুখে আনওয়ার আলির বংশ মর্য্যাদা, রূপ, গুণ, বয়স, খ্যাতি এবং সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার মেজাজের সুখ্যাতি শুনিয়া, মোমেনা ভাঙ্গা গড়া করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, এবং স্বামী সকাশে বলিলেন যে "আমার বোধ হ'চ্চে এই বিবাহে রশীদা আমাদের সুখী হইবে; এখন খোদা তায়ালার হাত।"

আনওয়ার আলি সম্বন্ধায় নানা কথা বলিতে বলিতে ও শুনিতে শুনিতে উভয়ে নিদ্রাগত হইলেন।

প্রভাতে উঠিয়া মোমেনা মাতৃ সন্নিধানে ছুটিয়া গেল। মা তখন প্রাভাতিক নমাজ পড়িয়া জায়ে নমাজেই বসিয়া তছবিহ জপ করিতে-ছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

——:o:——

কন্যা নিকটে আসিতেই স্নেহশীলা মাতা তাড়াতাড়ি জায়ে-নমাজটি উঠাইয়া এবং হস্তস্থিত জপমালা যথা স্থানে রক্ষা পূর্ব্বক, তাহার মস্তকে ও পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে, জামাতার ভাল ক'রে খাওয়া দাওয়া না করিবার কারণ অনুসন্ধান ও তাঁহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

মোমেনাও সেই ফাঁক খুজিতেছিল। কেন যে জামাতা খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে এবার এত নিস্পৃহ, তাহাই মাতাকে বুঝাইবার ছলে মোমেনা স্বামীর নিকট শ্রুত উকিল সাহেব ঘটিত আদ্যোপান্ত ঘটনা প্রকাশ করিল। এবং তৎসঙ্গে তিনি যে, যে কোন প্রকারে হউক রশীদার সহিত উকিল আনওয়ার আলি সাহেবের বিবাহ দিয়া দিবেন প্রতিশ্রুত ও অঙ্গীকার বদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিলেন।

হাফেজ ফজলর রহমান সাহেবের পত্নী বর্দ্ধমান জেলাভুক্ত কোন সমৃদ্ধিশালী মসলমান পল্লী নিবাসী এক বিখ্যাত অতি পুরাতন ভদ্র-বংশীয়া আয়মাদার কন্যা ছিলেন। পর্দ্দা রক্ষার ভয়ে জীবনে তিনি পাল্কী ভিন্ন কখনও অন্য কোন যান বাহনে আরোহণ করেন নাই। এবং

সেই পাল্কীও, দস্তুরমত ঘেরাটোপ আবদ্ধ না থাকিলে, তিনি তাহার মধ্যে প্রবেশই করিতেন না।

কন্যার মুখে, পুত্রের তোলা সেই গ্রুপ ছায়া চিত্রটির কথা শুনিয়া, এবং তাঁহার তছবির যুক্ত ঐ ফটোটি পরহস্তগত হইয়াছে বুঝিয়া, তিনি রাগ ও ঘৃণা সূচক ভ্রু কুঞ্চিত করিলেন।

বলিলেন, "মা এই জন্যই আমি ফটো উঠাইতে অত অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিলাম। এখন দেখ দেখি আমার ফটোটি কি না যা'র তা'র হস্তে নেচে নেচে বেড়া'চ্ছে। এ কথা তোমার আব্বা শু'নলেই বা কি মনে ক'রবেন। দামান্দ মিয়ারও অন্ততঃ আমার ফটোটি সম্বলিত তছবির, যা'র তা'র হাতে দেওয়া কিছুতেই ভাল হয় নাই।"

মোমেনা মাতার কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, ও মাতার মুখাবলোকন করিয়া স্পষ্ট বুঝিলেন যে, আনওয়ার আলির সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া দূরের কথা, তাহার নামেই তিনি অসন্তুষ্টা।

কন্যার তদানীন্তন অবস্থা দর্শনে, স্নেহময়ী মাতার প্রাণে কষ্টের উদ্রেক হইল ও তিনি অন্য কথায় ভুলাইবার ছলে মোমেনাকে ডাকিলেন—

"মা—"

"কেন আম্মাজান—"

"তুমি দামান্দমিয়াকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে, ভাল রকম ক'রে বল যে, দোজবরের হাতে কি তাঁহার একমাত্র শ্যালীকে সমর্পণ করা তিনি পছন্দ করেন? আবার যেমন তেমন নয়, তার আগের পক্ষের

একটা মেয়েও বর্ত্তমান। যাক্, দামান্দমিয়াকে বল গিয়ে, যে তিনি বেশ ভাল রকম ও সদ্বংশ জাত সৎপাত্র দেখে তাঁর ছোট ভগ্নীর বিবাহ দেন, আমাদের তা'তে কোন আপত্তি হ'বে না। তবে ওরই মধ্যে একটু দেখে শুনে ক'রে দিন।"

ইহাতেও কন্যার মুখের কোন পরিবর্ত্তন না দেখিয়া, মাতা অগত্যা বলিলেন, " আচ্ছা তোমার বাপকে একবার বলে দেখি।"

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মাতা পুত্রীর ঘরের মধ্যে উপরোক্ত কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময় হাফেজ সাহেব হাসিতে হাসিতে, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কন্যাকে লক্ষ করিয়া স্নেহস্বরে বলিলেন—

"কিগো মুনি তোমার মাতার সহিত এত কিসের গল্প হচ্চে? তোমার বাপকে কি একটুও বলবে না?"

তিনি ঘরে প্রবেশ করিবার সময় উহাদের মাতা পুত্রীর কথার সামান্য যাহা আভাষ পাইয়া ছিলেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ লোকের বুঝিতে বাকী ছিল না যে, ইহা তাঁহারই কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা। কিন্তু তিনি যেন কিছু মাত্র শুনিতে বা জানিতে পারেন নাই, এই মত ভাব প্রকাশে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

মোমেনা হাসি মুখে পিতার কথার উত্তর দিল, বলিল "আব্বা আসুন, মাকে যে গল্প বলিতে ছিলাম আপনাকেও তাহা বলিব।"

"আচ্ছা তবে বসি" বলিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া তাহাতে বসিতে বসিতে হাফেজ সাহেব বলিলেন "কই মা তোমার গল্প বল।"

মোমেনা অমনি মাতার মুখের দিকে চাহায়, মাতা তাহার চাহনির

অর্থ বুঝিয়া বলিলেন "লজ্জা কি মা, বাপ মায়ের কাছে আবার লজ্জা, বল না।" এই বলিয়া তিনি স্বামীর দিকে ফিরিয়া মোমেনার নিকট যাহা যাহা অল্পক্ষণ পূর্ব্বে শুনিয়া ছিলেন, সমস্তই বিবৃত করিলেন।

একান্ত চিত্তে তন্ময় হইয়া, এই অস্বাভাবিক স্বপ্ন বৃত্তান্ত এবং জামাতার প্রতিজ্ঞাবদ্ধতার বিষয় শুনিয়া, হাফেজ সাহেব কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; পরে গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন—

"দামান্দ মিয়া যাহা বলিয়াছেন, সে হ'লে ত' খুব ভালই হ'ত। আনওয়ার আলির মত ছেলে, আজ কালের বাজারে খুব কমই পাওয়া যায়; তাদের বংশও খুব ভাল আমি জানি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ এবং তা'রও অধিক যে তাঁর মেয়ে বর্ত্তমান।

গৃহিণী অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আমিও মুন্নিকে এতক্ষণ তাই বলিতে ছিলাম। রশীদা আমার সরলা বালিকা, সে সংসারের কিছুই জানে না বা ভাল মন্দ বোঝে না। তা'তে সপত্নী কন্যা নিয়ে কি ক'রে ঘর ক'রবে।"

মোমেনা দুঃখিত স্বরে বলিল, "আমাতে আর রশীদাতে পিঠোপিঠি, কিন্তু এত বড় হ'য়েছি একদিনের তরেও হিসো হিসি বা ঝগড়া কোন্দল হয় নাই। আমি বরং কাপড় গহনা যা' আসে, ভাল দেখে আগে বেছে নেই। ও তাতে একটুও রাগ কি দুঃখ কোন দিনই করে না। সেই জন্যই ব'লছি মা, রশীদা সতীন মেয়ে নিয়ে ঘর ক'র্ত্তে কখনই কষ্ট বোধ ক'রবে না।

আপনারা আপত্তি ক'র্‌ছেন বটে, কিন্তু আমার কাজটা খুবই পছন্দ হ'য়েছে। কি বলেন আব্বা?"

কর্ত্তা এবার হাসলেন, ব'ল্‌লেন তুমি আমার মুরুব্বি মা কিনা তাই তোমার অবোধ ছেলেকে সম্বন্ধটা ভাল ক'রে বুঝোবার চেষ্টা ক'র্‌চ। কিন্তু এটা ঘোর কলি, কলিকালের ছেলেকে বাপ মায়ে বুঝিয়ে সমজিয়ে বাগাতে পারেনা মা!

কন্যা করুণভাবে পিতার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তবে কি সত্যই আপনাদের মত নাই আব্বা?"

পিতা মুখে সাবেক গাম্ভীর্য্য আনয়ন করিয়া বলিলেন, "না মা; তামাশা নয়, সত্যই আমার মত নেই; তবে তোমার মায়ের মতামতের কথা আমি ব'ল্‌তে পারি না।" একটু থামিয়া আবার বলিলেন, দোজ পক্ষের, বিশেষতঃ ছেলে মেয়ে বর্ত্তমানে স্বামীর ঘর করা যে কত কঠিন, তা তুমি কি বুঝ্‌বে মা, আর আমিই বা তোমাকে কি ক'রে বোঝাব!

কথায় বলে যে সোল্‌টা পালিয়ে যায় সেইটেই বড়। এটা যে শুধু কথার কথা তা' নয়। প্রত্যেকেরই মনের ধারণা তাই। পরেরটা খুব বড় হইলেও, যেমন ধীবরের মনের ধারণা যে আগেরটার চেয়ে এটা ছোট; সেইরূপ পুরুষ মানুষের প্রথম স্ত্রী যদি খারাপও হয়, দ্বিতীয়টা তদপেক্ষা ভাল হইলেও শীঘ্র তার মন উঠে না। আনওয়ার আলির প্রথমা স্ত্রী শুনেছি, রূপে গুণে দুইতেই খুব ভাল ছিল।

এতক্ষণ গৃহিনী পিতাপুত্রীর কথোপকথন মনোনিবেশ পূর্ব্বক শুনিতেছিলেন, একটা কথাও বলেন নাই। এক্ষণে উভয়কে বিশ্রান্ত দেখিয়া, উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "তুমি ঠিক ব'লেছ, আমি আগে অতটা ভাবি নাই। আর বিয়ে না দিলে জামাই রাগ ক'র্‌বেন শুনে,

আমি বোকা ব'নে গিয়েছিলুম। তা জামাই রাগই করুন আর যাই করুন, এ বিয়ে কিছুতেই হ'তে পারে না।

রশীদা আমার কচি মেয়ে, তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে এখনও খাওয়াতে হয়। জোর ক'রে আদর ক'রে তার চুল বেঁধে দিতে হয়। সেই মেয়ে কখনও পরের মেয়ের সেবা যত্ন ক'র্ত্তে পারে? আর তা না ক'ল্লেই মেয়ের বাপের মন খুঁৎ খুঁৎ ক'ববে, মনে ক'রবে মেয়েকে আমার দেখতে পারে না। আবার তাই নিয়ে খুটি নাটি, মুখ বেঁকাবেঁকি আরম্ভ হবে। দেখে শুনে মেয়ে আমার বুক ভাঙ্গা হ'য়ে যাবে। প্রভাতের কুসুম আমার অকালে শুকিয়ে যাবে। বাপরে, সে আমি সহ্য ক'রতে পারব না, কখনই পারব না, প্রাণ গেলেও নয়।"

পিতামাতার যুক্তি ও আঁটাআঁটি শুনিয়া, বেচারি মোমেনা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল, তাইত আমি এ কি ক'রছি! আহাম্মকের মত কোন বিষয় ভেবে না দেখে, আমার আদরের রশীদার কি সর্ব্বনাশ ক'রতে যাচ্ছি; আর সেই সঙ্গে স্নেহময় পিতামাতার প্রাণে কষ্ট দিচ্ছি! না না, তা হবে না, এ বিয়ে কখনই হ'তে পারে না।

আমি ওঁকে বুঝিয়ে বল্লে উনি রাগ কত্তে পারবেন না বা ক'রবেন না।

দশম পরিচ্ছেদ।

--- :০:--

মোমেনা তৎক্ষণাৎ স্বামীর কাছে গেল, দেখিল স্বামী উদ্বিগ্ন ভাবে দ্বারের দিকে চাহিয়া তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। গৃহে প্রবেশ করিতেই উৎসুক নেত্রে তাহার দিকে হাসিয়া বলিলেন, "তুমি খবর ভাল ত'? আমি শুনবার জন্য ছট্ ফট্ ক'রচি, দেরি দেখে আমি অস্থির হ'য়ে প'ড়ে ছিলাম।"

মোমেনা ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া এবং তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলিল "খবর এক রকম ভালই বটে। দেখ, খোদা যাহা করে ভালর জন্য করে; তা' না হ'লে রশীদার বিয়েতে মা বাপ এত আপত্তি করবেন কেন?

এখন আমারও মনে হচ্চে, ওখানে বিয়েটা না হওয়াই ভাল। সব কথা শুনলে তুমিও আমাদের মতে মত দিবে।" এই বলিয়া বিবাহ সম্বন্ধে পিতা মাতা যাহা যাহা বলিয়াছেন, সমস্তই মোমেনা স্বামী সন্নিধানে নিবেদন করিল।

এতগুলি কথা বলিবার সময় মোমেনা, একটিবারও স্বামীর মুখের দিকে চাহে নাই। হঠাৎ মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখ দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল।

দেখিল তাঁহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর, ঝড়ের পূর্ব্বে পৃথিবী যে রূপ গম্ভীরভাব ধারণ করে, ডাক্তার সাহেবের মুখ ভাব ঠিক সেই-রূপ। মেমেনা পুনরায় শিহরিয়া দৃষ্টি অবনত করিল।

আনন্দ মাখান মুখে, আজ আবার নিরানন্দের ছায়া দেখিয়া, সদা হাস্যময় মুখে আবার বিষাদের ভাব দেখিয়া, শিশুর ন্যায় সরল মুখে, আজ ম্লান গম্ভীর রেখা দেখিয়া ; প্রাণ শিহরিয়া উঠিল।

সদাচঞ্চল তরঙ্গায়িত সাগরপৃষ্ঠকে হঠাৎ তড়াগ প্রায় স্তব্ধ শান্ত মূর্ত্তি হইতে দেখিলে, মনে স্বতঃই একটা ভয়ের উদ্রেক হইয়া থাকে।

মোমেনার স্বাভাবিক ঈষৎ গোলাপি আভাযুক্ত গণ্ডদ্বয় আজ হঠাৎ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, এবং অজ্ঞাতপূর্ব্ব আশঙ্কায় তাহার হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরিতে লাগিল।

হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে ডাক্তার সাহেব উঠিয়া দাড়াইলেন। জোর করিয়া মুখে কাষ্ঠ হাসি আনয়ন করিয়া বলিলেন—

"আসি তবে মোমেনা, আশা করি তোমরা উভয় ভগ্নীতে পিতা মাতার স্নেহ বন্ধনে সুখেই থাকিবে। আমার কথা ভুলে যে'ও।" বলিয়া শেষোক্ত কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই, নিজের বৃহৎ গ্লাডষ্টোন ব্যাগটি হাতে লইয়া, ঘর হইতে এক রকম ছুটে'ই নীচে নামিয়া গেলেন। মোমেনা একটা কথা বলিবারও অবসর পাইল না।

অকস্মাৎ এই ঘটনা এত শীঘ্র ঘটিয়া গেল যে, মোমেনা কিছু বুঝিতেও পারিল না। শুধু বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে মুগ্ধদৃষ্টিতে, স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় চারিদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল।

ক্রমে শূন্য ঘর খানার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, পূর্ব্বাপর

সকল কথা মোমেনার মনে পড়িয়া গেল, এবং হঠাৎ স্বামীর অন্তর্দ্ধানের কারণ উপলব্ধি করিয়া, তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অন্তস্থিত দারুণ যন্ত্রণায় হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল।

মোমেনা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার বোধ হইল যেন শরীরের সমস্ত রক্ত, চন্‌ চন্‌ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হইয়া মাথায় উঠিয়া, মস্তক ঘুরাইয়া দিল। মোমেনা চক্ষে অন্ধকার দেখিল, অসহ্য যন্ত্রণায় একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত "উঃ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। সঙ্গে সঙ্গেই মূর্চ্ছা তাহাকে সংজ্ঞাহীন করিয়া, ছিন্ন কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে নিপাতিত করিল।

পূর্ব্ব বর্ণিত যে সোফায় অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায়, ডাক্তার চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন উল্লেখ করিয়াছি ; ঐ সোফার নিকটেই পড়িয়া যাইবার কালে, সোফার কঠিন কাষ্ঠনির্ম্মিত ফ্রেম লাগিয়া মস্তকের বাম পার্শ্বে খুব একটা গুরুতর জখম ও তৎসঙ্গেসঙ্গে অত্যধিক রক্তস্রাব হইতে লাগিল।

হঠাৎ উপরতলায় কি একটা পতন শব্দ পে'য়ে, পার্শ্বের অপর কক্ষ হইতে, তাড়াতাড়ি সেলায়ের হাত কলটি ফেলিয়া, রশীদা খাতুন ছুটিয়া বাহির হইল, এবং তাহার ভগ্নীপতি ঘরের মধ্যে আছেন মনে ভাবিয়া, রশীদা দোরের ফাঁক দিয়া উকি মারিয়া দেখিল, ভগ্নী মূর্চ্ছিতা অবস্থায় ভূপতিতা ও অঙ্গ রক্তাপ্লুত।

রশীদা তাহার একমাত্র প্রিয় ভগ্নীর এতদবস্থা অবলোকন করিয়াই, "আম্মা শীঘ্র আসুন গো" বলিয়া দ্বার খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, ও মুর্চ্ছিতার পার্শ্বে বসিয়া "ও বাবা কি হ'ল গো" বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে মাতা ধুড়মুড় করিয়া উপরে আসিয়া, কন্যার অবস্থা দেখিয়া "হায় কি হ'ল গো" ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করায় অল্প সময়ের মধ্যেই বাড়ীর সমস্ত মেয়ে ছেলেরা কক্ষ মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কর্ত্তা সংবাদ পাইবা মাত্র, দহলিজ হইতে একখানি মাত্র চটিজুতা তাড়াতাড়িতে পায়ে দিয়াই আসিয়া উপস্থিত। তিনি অবস্থা দেখিয়া, প্রথমতঃ সমস্ত লোকগুলি সরাইয়া দিয়া, রক্ত মুছিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। রাণীদা বসিয়া মূর্চ্ছিতা ভগ্নীর দেহে তালবৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিল।

বহরমপুরে বড ডাক্তার আনিতে অশ্বারোহণে লোক ছুটিল, এ-দিকে গ্রামের শশী ডাক্তারকেও খবর দেওয়া হইল।

শশী বাবু পাস করা ডাক্তার না হইলেও, ক্যাম্বেলের পাস করা কম্পাউণ্ডার বিধায়ে, ঔষধ প্রস্তুতে ও ব্যাণ্ডেজ আদি বাঁধার কার্য্যে ক্ষিপ্র-হস্ত ছিলেন।

খবর পাইয়া শশী বাবু হাঁটিয়াই চলিয়া আসিলেন, তখনও রোগীর আহত স্থান দিয়া ক্রমাগত রক্ত বাহির হইতেছে। শশী ডাক্তার, কাহাকেও কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া, স্বইচ্ছায় নিকটবর্ত্তী আল্‌না হইতে একটি পুরাতন ধোয়া সাড়ি টানিয়া লইয়া, তাহা ছিন্ন ছিন্ন করিয়া, একটি মোটা পলিতার ন্যায় প্রস্তুত করিলেন ও তদ্দ্বারা রোগীর মস্তকের আঘাত সুন্দর রূপে ব্যাণ্ডেজ করিয়া, একটী শেফ্‌টিপিন্‌ চাহিয়া লইয়া ব্যাণ্ডেজের কাপড়ের মুখটি আটকাইয়া দিলেন।

রোগীর এখনও সংজ্ঞা হয় নাই। এমন সময় বাহিরে মহিষ শাবকের করুণ আর্ত্তনাদের অনুকরণে, এক বিকট শব্দের বংশীধ্বনির

সহিত, ঝগড়্ ঝগড়্, ঝগড়্ ঝগড়্ শব্দ হওয়ায় সকলেই ডাক্তার সাহেব এসেছে বলিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

গ্রামের ছেলেগুলো, 'মোটারগাড়ী, মোটারগাড়ী' বলিতে বলিতে সেই দিকে ছুটিয়া আসিল। হাফেজ সাহেব কাঁদ কাঁদ মুখে নামিয়া আসিয়া ডাক্তার সাহেবের করমর্দ্দন করিলেন।

এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে হাফেজ সাহেব, স্থানীয় বেঞ্চের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বার থাকা প্রযুক্ত সদরের প্রায় সকল অফিসারের সহিতই তাঁহার অল্প বিস্তর পরিচয় ছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

——(:•:)——

ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে লইয়া, হাফেজ ফজলর রহমান সাহেব মোমেনার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়াই, সম্মুখে একটি আপাদ মস্তক চাদরে আবৃত মনুষ্যাকৃতি জীব পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া হাফেজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"এ কেয়া চিজ হ্যায় হাফেজ সাহাব ?"

হাঃ— "এহিতো মেরা বেটি, দেখিয়েনা সাহাব গিরকে এসকা কেয়া হাল হুয়া।"

ডাঃ— 'এসকো ঘ্যায়ছা করকে রাকটা কাহে ? এ কেয়া মাড় গেয়া ?"

হাঃ— "নাউজ বিল্লাহ ; এ আভিতক বে হোস হ্যায়।"

ডাঃ—"টব, কপড়া মোড়নেসে কেয়া জল্দি হোস হোগা ? আভি কাপড়া খোল ডো।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই পাখা ব্যজন কারিণী ঝি আমিরণ, হাফেজ সাহেবের অনুমতি না লইয়াই, গাত্রের আবরণ খুলিয়া ফেলিল ও আপন মনেই পূর্ব্ববৎ বাতাস করিতে লাগিল।

বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে যেন একটি আধ ফুটন্ত কুঁড়ি দিয়া সযত্নে বাঁধা, গোলাপ ফুলের তোড়া বাহির হইয়া পড়িল। আহা! কি রূপের মাধুরী, কি অঙ্গ সৌষ্ঠব; ডাক্তার সাহেব রূপ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

মোমেনা এখনও নিস্পন্দ, এখনও তাহার চক্ষু মুদ্রিত। রক্ত ধুইয়া দিলেও এখনও মস্তকের ঘনকৃষ্ণ কেশের ভিতরে ভিতরে, ভ্রুর মধ্যে, চক্ষের কোণে এবং গলায়, জমাট বাঁধা রক্ত কণিকা লাগিয়া রহিয়াছে। ডাক্তার একটি চেয়ারে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নির্ণিমেষনেত্রে এই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শেষে রোগীর সংজ্ঞা উৎপাদনে যত্নবান হইয়া, দুই একটি ঝাঁজাল ঔষধের শিশি নাকের নিকট ধরিতেই রোগীর সংজ্ঞা হইল।

জ্ঞান হইবা মাত্র মোমেনা, ঘরের মধ্যে এতগুলি সম্পূর্ণ অচেনা মুখ দেখিয়া লজ্জায় ম্রিয়মান হইলেন, ও দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিতে গিয়া, ব্যাণ্ডেজে হাত পড়ায় মৃদুস্বরে "এ কি!" বলিয়া ঘোমটা সহ গাত্রের চাদরটিতে সমস্ত মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

তখন হাফেজ সাহেব, ডাক্তার সাহেব ও শশী বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "আপনারা একটু বাইরের দিকে চলুন, মেয়েটা বড়ই লজ্জা পেয়েছে। এই নন্দা বারাণ্ডায় খান দুই তিন চেয়ার শীঘ্র দে'ত।"

নন্দ মালী বাহিরে চেয়ার দি'ক, ইত্যবসরেআমরা হাফেজ সাহেবের একটু ভাল করিয়া পরিচয় দেই।

পাঠক পাঠিকা, আপনারা সকলেই জানেন যে, মসলমান সমাজে

ইংরাজি চর্চ্চাটা অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। ভদ্র মসলমানেরা তখন ইংরাজি ভাষাটিকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ছেলেপিলেকে ইংরাজি পড়াইবার নামে কানে আঙ্গুল দিয়া বসিতেন।

তাঁদের ধারণা ছিল যে ইংরাজি পড়িলে মৃত্যুর সময় মুখ দিয়া পবিত্র কল্‌মা পাকের পরিবর্ত্তে, ইংরাজি শব্দ বাহির হইবে ও পরকালে নরকের পথ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

এই অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া, হাফেজ ফজলর রহমান সাহেবের পিতা অগাধ সম্পত্তির অধিকারী ও সর্ব্ব রকমে পড়াইবার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, এক মাত্র মেধাবী পুত্রকে ইংরাজি না পড়াইয়া কেবল আরবি ও পারসীক ভাষায় যথেষ্ট শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

আবার বলি এই ভ্রম বিশ্বাসই মসলমান জাতির অধঃপতনের প্রধান কারণ।

যে জাতি বিভিন্ন দেশ হইতে নানা বিদ্যা সংগ্রহ করিয়া, এক সময়ে বিদ্যা বুদ্ধি বলে উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল; যে জাতি তদানীন্তন অসভ্য ইউরোপ খণ্ডকে বিদ্যাদানে সুসভ্য করিয়া তুলিয়াছিল; এবং যাহার প্রদর্শিত পথাবলম্বনে আজি ইউরোপ পৃথিবীর মধ্যে জ্ঞান গরিমায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে; হায়! সেই সুসভ্য এস্‌লাম সন্তানগণ, আজ নিজ বুদ্ধি দোষে ও পিতৃ পুরুষগণের দারুণ আহম্মুকির দরুণ, সামান্য নিকৃষ্ট হেয় জাতির নিকটেও পদদলিত!

আজ ১৫।১৬ বৎসর হইতে, মোস্‌লেম সন্তানগণের মধ্যে ইংরাজি বিদ্যাভ্যাসের যেরূপ চর্চ্চা হইয়াছে ও হইতেছে, যদি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার এক চতুর্থাংশও উদ্যম থাকিত, তাহা হইলে কি আজ ইহাদিগকে

এইরূপ নিকৃষ্ট ভাবে পদদলিত হইতে হইত !

উঃ ! অনেক দূর আসিয়া পড়িলাম। হাফেজ সাহেব আদৌ ইংরাজি না জানিলেও, সপ্তাহে দুই দিন করিয়া অবৈতনিক বিচারকের আসনে বসায়, এবং বোর্ডের মিটিংয়ে যাতায়াত করায়, অভ্যাস বশতঃ কিছু কিছু ইংরাজি বুঝিতে পারিতেন।

হাফেজ সাহেব ডাক্তার সাহেবকে লইয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করায়, ডাক্তার সাহেব যাইবার পূর্ব্বে একবার ষ্টেথেসকোপ যন্ত্র সাহায্যে রোগীর বক্ষস্থল পরীক্ষা করিবার অভিমত প্রকাশ করিয়া নিজ কোটের বাম পকেট হইতে রবারের এক জোড়া ঠ্যাং বিস্তার কারি যন্ত্র বাহির করিয়া, এবং দুই কাণে দুইটি চাকচিক্য ধাতুময় মুখ প্রবেশ করাইয়া দিয়া, নিজ বক্ষে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন।

"হাফেজ সাহেব, হাম্ heart একজামিন করেগা, আপকো this end ঠো বাবাকা chest আউর back মে লাগা দেনে হোগা I shall examine it."

যুবতী কন্যার বক্ষস্থলে ঐটি বসাইতে হইবে শুনিয়া, হাফেজ সাহেব তাড়াতাড়ি, "ঝি ঝি, আমিরণ এদিকে একবার এস ত' গা" বলিয়া ডাকিলেন।

ঝি বেচারি নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে মানুষ ; সে এই মাত্র নূতন এ বাড়ীতে এসেছে। জীবনে কখনও ধবল চর্ম্মের উপর কটাচক্ষু বিশিষ্ট কোট প্যান্টুলন ধারী মানব দেখে নাই। আবার সাহেবেরা মদ খায় ও শূকরের মাংস খায় শুনে ইংরাজ জাতির উপর পল্লিবাসিনী বৃদ্ধা ঝির আন্তরিক ঘৃণা।

ডাক্তার সাহেবকে গো অশ্ব বিহীন যানে আসিতে দেখিয়া, তদ-বধি ঝি বেচারির মনে এক আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। সে মোমেনার কক্ষ হইতে উঠিয়া গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে, কেবল কৌতুহল নিবারণার্থে গোপনে থাকিয়া, এক এক বার ডাক্তার সাহেবের ধব্ধবে কলি ফেরান সাদা মুখটির পানে দেখিতেছিল। হঠাৎ মনিবের ডাক পড়ায় তাহার মনে ভয় হইল।

বেচারি লাচার হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, খুব লম্বা ঘোমটা টানিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। হাফেজ সাহেব উচ্চ স্বরে বলিলেন, "বাপু এখন ঘোমটা রাখ, সাহেবের হাতের নলটির ঐ মুখটি নিয়ে, মুমির বুকটার দুই তিন স্থানে চেপে চেপে ধর। আর মা মোমেনা তুমিও একটু একটু নিঃশ্বাস ফেল্‌তে থাক।

ভাল কথা তুমিও ত একজন সিভিল সার্জ্জনের পত্নী, তোমাকে অত শিখাতে হবে কেন?"

শেষোক্ত কথা বুঝিতে পারিয়া ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "কেয়া আপকা son-in-law ভি civil surgeon, উন্‌কা নাম ক্যা হায়?"

"আহম্মদ হোসেন।"

"ওঃ আমেড হোসেন, Mr. Hosen. হোসেন সাহাব ও হাম বেলায়েৎ মে এক সাট ডাক্তারি পড়টা, আউর এক সাট পাশ কিয়া, ওহ মেরা ডোষ্ট হায়।"

এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিয়া মোমেনার মন যেন একটু আশ্বস্ত হইল। বৃদ্ধা ঝি কম্পিত হস্তে কোনমতে ষ্টেথেস্‌কোপ যন্ত্রমূল তাঁহার বক্ষস্থলে বসাইতে পারিতেছেনা দেখিয়া, মোমেনা নিজে ঝির হস্ত হইতে

যন্ত্রটি লইয়া বক্ষের তিন চারি স্থানে স্থাপন করিতে লাগিল। শেষে তাহার পিতা মোমেনার হস্ত হইতে লইয়া, তাহার পৃষ্ঠের ২।৩ যায়গায় লাগাইতেই ডাক্তার সাহেব বলিলেন।

"আউর ডরকার নেহি, এস্‌মে কুচভি ডরনেকা চিজ নেহি হ্যায়। there is no fear in it. কিন্তু আপকো good care লেনে হোগা ; যেছমে excitement না হোনে সাকে"। পরে শশী ডাক্তারকে মিশ্রিত ইংরাজিতে দুই চারিটি উপদেশ দিয়া ডাক্তার সাহেব গমনোদ্যত হইলেন।

ঐ সময় হাফেজ সাহেব তিন খানি দশ টাকার নোট ও তৎসহ দুইটী টাকা আনিয়া ডাক্তারের হস্তে দিতে যাওয়ায় "এ মেরা ডোষ্ট কা wife হ্যায়, হাম fee লেনে নেহি সাকৃটা I can't charge any professional fee from my friend, a doctor. এক ডাক্টার কো আউর ডাকটারছে ফি লেনা মানা হ্যায়।" বলিয়া শশী বাবুর হাতে একটা ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া দিয়া, ডাক্তার সাহেব নীচে নামিয়া গেলেন।

ডাক্তার সাহেব চলিয়া যাইবার পব শশীবাবু বলিলেন, ফিট্‌টি কেবল হঠাৎ দুঃখ জনিত মানসিক উত্তেজনার জন্য হয়েছিল। প্রথম সে রকম গুরুতর নয়, তার জন্য কোন ভয়ের বা চিন্তার কারণ নাই। আমি আপাততঃ প্রত্যহ আসিয়া ড্রেস করিয়া দিব। আপনারা কেবল যাহাতে ইনি আর উত্তেজিত না হন, তৎপক্ষে বিশেষ যত্ন ও নজর রাখিবেন।

নন্দ আমার সঙ্গে চল্‌ত' আমি এখনই ঔষধ প্রস্তুত করে দিচ্চি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সংজ্ঞা লাভ করিয়া মোমেনা উঠিয়া বসিলেন ও চক্ষুরুন্মিলন করিয়াই মাতার ম্লানমুখ খানি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ম্লানমুখ ও কাতর দৃষ্টি দেখিয়া মোমেনার ক্ষুদ্র প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি তখন লজ্জিত ভাবে মায়ের কাছে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া অবসন্ন ভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।

পিতা এতক্ষণ কন্যার শিয়রে হতজ্ঞান হইয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ছিলেন। কন্যার চৈতন্য সঞ্চার হইয়া উঠিয়া বসিতে পারিয়াছে দেখিয়া, তিনি পার্শ্বে উপবিষ্টা রশীদাকে ইঙ্গিতে ঔষধের শিশিটি সরাইয়া দিতে বলিলেন। রশীদা নিকটস্থ টেবিলের উপর হইতে শিশি ও ছোট গ্লাসটি লইয়া পিতার হস্তে দেওয়ায় পিতা একদাগ ঔষধ ঢালিয়া শায়িতা অবস্থায়ই কন্যার মুখে গ্লাসটি ধরিলেন ; এবং মোমেনাও কষ্টে একটু মাথা তুলিয়া ঔষধ গলধঃকরণ করিল।

কক্ষস্থিত জানলার মুখে একটী ছোট তক্তপোষ বা অতিরিক্ত চৌড়াবেঞ্চ ফেলা ছিল। মোমেনা কখনও কখনও সেইটিতে বসিয়া সেলায়ের কার্য্য করিত, পান সাজিত, আবার অবকাশ মত বসিয়া কার্পেট

বুনিত বা বই পড়িত।

হাফেজ সাহেবের ইঙ্গিতে, সেই তক্তপোষ বা বেঞ্চটির উপরিস্থিত সমস্ত দ্রব্য সরাইয়া ফেলিয়া অল্পক্ষণ মধ্যে উহাতে সুকোমল বিছানা রচনা করা হইল। পিতা মাতা ধরাধরি করিয়া মোমেনাকে উহার উপর শয়ন করাইয়া দিলেন।

মোমেনা শায়িত অবস্থায় জানালার দিকে ফিরিয়া বাহিরের চারা আম বাগানের সতেজ সুন্দর গাছগুলি নিরীক্ষণ করিতেছে। অল্প বাতাসে গাছের পাতাগুলি যেমন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিতে ছিল, মোমেনার বুকের ভিতরও থাকিয়া থাকিয়া তেমনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের হাওয়া, অব্যক্ত বেদনায় তাহার ক্ষুদ্র বুকখানাকে আলোড়িত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবার মত করিতেছিল।

এমন সময় পিতা মস্তকের নিকট আসিয়া আদরের জ্যেষ্ঠা কন্যা মোমেনাকে দয়াদ্র-কম্পিত কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন "মা এই গরম দুধ টুকু খেয়ে নাওত'। তুমি হা কর, আমি শুয়ে থাকা অবস্থায়ই তোমার মুখে চামচ দিয়ে একটু একটু ক'রে খাইয়ে দেই। লক্ষ্মী মা আমার এই টুকু খাও।"

মোমেনা পিতার কণ্ঠস্বর শুনে কষ্টে পাশ ফিরিলেন, এবং তাঁহার মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া কি জানি কেন তৎ-ক্ষণাৎ যেন ভয়ে বিহ্বল হ'য়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া লইলেন।

তাহার হৃৎপিণ্ডে রক্ত তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। কোন অজানা ভয়ে তিনি আর পিতার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না।

মোমেনা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিল— মায়ের মুখ খানি

এত শুকনো দেখিলাম কেন ? চোখ দুটি যেন ছল্ ছল্ কচ্চে। পিতার মুখ বড়ই মলিন, দৃষ্টি যেন উদাস। ওঁদের মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্চে। মুখ দুখানি যেন সে মুখই নয়। অমন হাসি মাখা মুখে কে যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছে।

পিতা মাতার সদা প্রফুল্ল বদন মণ্ডলে গম্ভীর চিন্তা রেখার আভাষ অনুভব করাইয়া, দুশ্চিন্তা মোমেনার অন্তরে তপ্তশেল বিঁধাইতে লাগিল।

মোমেনার চক্ষু পল্লব ও ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহাদের স্নিগ্ধ নির্ম্মল মুখে আজ হঠাৎ উদ্বেগের কারণ খুঁজিতে গিয়া, মোমেনার মন অস্থির হইয়া পড়িল। ভাবিল, আমার কি খুব বেশী অসুখ ক'রেছে ? আবার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, না তার জন্য নয়! তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া ওরূপ ভাবে চলিয়া গেলেন, হয় ত' সেই জন্যই ওঁদের এত চিন্তা।

স্বামীর কথা মনে পড়ায়, মোমেনার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ভিতর থেকে একটা প্রশ্ন ঠেলিয়া ঠেলিয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত আসিতে লাগিল, মুখ ফুটিল না। কেবল মনে উদয় হইতে লাগিল তিনি এখন কোথায় ? আর কি তিনি আসিবেন না ? এ দাসীকে কি তিনি চিরকালের মত পায়ে ঠেলিয়া গেলেন ?

হায়! আমি কেন ওরূপ কথা তাঁহাকে শুনাইলাম। আমিত' গোড়ায়ই বুঝিয়াছিলাম, যে তিনি ঐ বিবাহ সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে কেন আমি পোড়ারমুখী জ্ঞাতসারে তাঁহার নিকট নিজেরও অমত প্রকাশে "ও বিয়ে দেওয়া হ'বে না" বলিতে গেলাম। হা নাথ! তুমি তোমার দাসীকে পদদলিত করে কোন্ বিদেশে চলিয়া গেলে ?

মোমেনার কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল ; মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। বক্ষস্থল আলোড়িত করিয়া জোরে শব্দ হইতে লাগিল। মোমেনা বিবেচনা করিতে লাগিল, যেন কে তাহার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিয়া মুগুরের ঘা মারিতেছে।

আবার পিতা মাতার চিন্তাক্লিষ্ট মুখচ্ছবি তাহার মনে উদয় হইল। মোমেনা আবার ভাবিল, আচ্ছা তিনি চলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই কি ওঁদের এইরূপ ভাবান্তর? না আর কিছু, আর কিছুই বা কি? তবে কি তাঁর কোন অমঙ্গল হয়েছে? খোদা রক্ষা কর, আমিন।

মুহূর্ত্তে মোমেনার মুখ খানা এই পুস্তকের কাগজের ন্যায় সাদা হইয়া গেল। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস পড়িতে লাগিল ; চক্ষু পল্লব কাঁপিতে লাগিল, তাহার গাত্র বস্ত্র ঘর্ম্মে ভিজিয়া উঠিল।

পিতা মাতা আকুল ভাবে কন্যার মুখের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া রুদ্ধ-স্বরে 'মা মা, কি হ'ল মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অকস্মাৎ মোমেনা শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, এবং ভয় বিহ্বল লোচনে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া, পরক্ষণেই আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

ডাক্তার সাহেব শ্বশুরালয় হইতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া ব্যাগ হস্তে রাস্তায় আসিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিপরীত দিক হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ি আসিতেছে দেখিয়া কোচওয়ানকে "এই গাড়ওয়ান ষ্টেশনে ভাড়া যাবি?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কোচম্যান "হুজুর ষ্টেশনেই ত' যাচ্চি" বলিয়া কোচবাক্স হইতে লাফাইয়া পড়িয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল।

ডাক্তার নীচে হইতেই ব্যাগটি সামনের সিটে রাখিয়া নিজে তাড়াতাড়ি গাড়ির ভিতর উঠিয়া পশ্চাতের স্থানটি দখল করিয়া বসিলেন।

গাড়ি দ্রুতবেগে ষ্টেশন অভিমুখে ছুটিল। আহম্মদ হোসেন বিষণ্ণ মনে তন্মধ্যে বসিয়া আকাশ পাতাল কতই কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তার বিরাম নাই।

ডাক্তার সাহেবের প্রথম চিন্তা হইল, এখন কোথায় যাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে উদয় হইতে লাগিল, প্রিয়তমা পত্নীকে কোন পত্র লিখিয়া যাইব কি না?

একবার ভাবিলেন, যাই প্রাণের বন্ধু আনওয়ার আলির সহিত

একবার দেখা করি গিয়ে। আবার বলিতে লাগিলেন, কোন মুখ লইয়াই বা তাহার নিকট 'ভাই আমার দ্বারা হইল না" সুসংবাদটি দিতে যাইব। না তা' হ'তেই পারে না। এ মুখ আর আনওয়ারকে কিছুতেই দেখাইব না।

শুধু আনওয়ার আলিকে কেন, যে যেখানে আত্মীয় স্বজন আছেন কাহাকেও আর এ মুখ দেখাইব না।

ডাক্তার সাহেব এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় অশ্বযান বহরমপুরের ষ্টেশন প্লাটফরমের নিম্নে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

একজন হিন্দুস্থানী কুলি আসিয়া, তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলিল ও ব্যাগটিতে হস্তস্থাপন করিয়া, ডাক্তার সাহেবের মুখের দিকে চাহিতেই তিনি "লে চালো" বলিয়া নামিয়া আসিলেন এবং পকেট হইতে বাহির করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে গাড়োয়ানের হস্তে একটি টাকা দিয়া, ওয়েটিং রুমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ঐ বিশ্রামাগারের সম্মুখেই, প্রাচীর গাত্রে একখানি খুব বড় সময় নির্দ্দেশক পত্রিকা সংলগ্ন ছিল। ডাক্তার সাহেব ঐ টি মিলাইয়া দিখিতেছেন দেখিয়া, হিন্দুস্থানী কুলিটা "হুজুর কোন তরফ যাইয়েগা, কালকাত্তাকা তরফ না লালগোলাঘাট কা তরফ" জিজ্ঞাসা করিল।

তখন ডাক্তার সাহেব কোন উত্তর না দিয়া মুটের হস্তে তিনটী টাকা দিয়া, কোন এক ষ্টেশনের নাম করিয়া একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট আনিতে বলিলেন।

কুলি টাকা পাইয়া পুনরায় "হুজুর যানে আনেকা, না খালি যানেকা?" প্রশ্ন করিল।

তাহাতে ডাক্তার একটী ছোট "খালি যানেকা" বলিয়া ব্যাগটি লইয়া ওয়েটিং রুমের মধ্যে গিয়া বসিলেন। একটি ছোট ছোকরা কোন কথা না বলিয়া, দোদুল্যমান টানা পাখার দড়িটি ধরিয়া আস্তে আস্তে টান দিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

ডাক্তার সাহেব ব্যাগ অভ্যন্তর হইতে দুইখানি লেফাফা ও দুইটি চিঠি লিখিবার কাগজ, এবং তৎসঙ্গে নিজের ফাউন্‌টেন পেনটি বাহির করিয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

এমন সময় রেলওয়ে পোর্টারটি একখানি সবুজ বর্ণের টিকিট ও আনা বার পয়সা ডাক্তার সাহেবকে ফেরৎ দিবার ছলে কক্ষস্থিত টেবিলের উপর রক্ষা করায়, তিনি টিকিট খানি লইয়া বাকি পয়সা কুলিটিকে তুলিয়া লইতে ইঙ্গিত করিলেন ও বলিলেন "ওছমেছে চার আনা উহ ছোকরাকো দো, আউর বাকি তোম লে লো।"

হিন্দুস্থানী পয়সা গুলি তুলিয়া লইয়া "সাহাব, কালকাত্তা ওয়ালি গাড়িকী আভি আউর আধা ঘণ্টা দেরি হ্যায়। হুজুর আরাম সে বয়ঠিয়ে। হাম ঠিক অক্তমে আ কর, হুজুর কা চিজ ওঠা দেগা" বলিয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার লিখিলেন—

মোমেনা—

প্রাণের মোমেনা আমার, আমাকে ভুলে যাও। আজ থেকে তোমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে মনে ক'রে, ক্রমশঃ প্রাণে সান্ত্বনা বারি সেচন করিতে আরম্ভ কর।

প্রাণে আমি বড়ই আঘাত পেয়েছি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য আমার

আর সংসারে মুখ দেখান উচিত নয়। আশীর্ব্বাদ করি খোদায় পাক তোমার প্রাণে সান্ত্বনা দিক। ইতি—

তোমার ভালবাসার অনুপযুক্ত

আহম্মদ হোসেন।

তৎপরে দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন।

প্রিয় সুহৃদ—

খুঁজে পেয়েও যখন তোমার স্বপ্ন রাণীকে তোমার করে সমর্পণ কর্ত্তে পাল্লুম না, তখন এ পোড়া মুখ আর জীবনে তোমাকে দেখাইব না।

প্রাণে বড়ই আঘাত পেয়েছি ভাই, বিদায়।

আহম্মদ হোসেন।

পত্র দুই খানি লেখা শেষ করে, একবার আদ্যোপান্ত পড়ে, ডাক্তার সাহেব দুই খানি খামে মুড়িয়া, শিরোনামা লিখিয়া স্বহস্তে ষ্টেশনের পোষ্ট বাক্সে ফেলিয়া দিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—— :o: ——

ট্রেন আসিল। মুটিয়া আসিয়া ব্যাগ লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর এক-খানি গাড়ির সম্মুখে গেল ও হাতল ঘুরাইয়া দরজা খুলিয়া দেওয়ায় ডাক্তার সাহেব তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পোর্টার ও ব্যাগ তুলিয়া দিয়া সালাম করিয়া অন্তর্হিত হইল।

জোরে সিটি দিয়া ট্রেন স্বাভাবিক গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। ঐ কম্পার্টমেণ্টে ডাক্তার সাহেব একাই ছিলেন। একা পাইয়া চিন্তা তাঁহাকে আরও চাপিয়া ধরিল, ও তাঁহার কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া নানা যৌক্তিক ও অযৌক্তিক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার কোন উপদেশেই ডাক্তারের মন উঠিতেছেনা দেখিয়া, চিন্তা মহাশয়া "তবে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, ও যেখানে ইচ্ছা হয় যাও, আমি আর কিছু বল্‌বনা" বলিয়া তন্দ্রা দেবীকে ডাকিয়া তাহার কাণে কাণে "বেচারা মনকষ্ট পেয়েছে, তুমি একটু সেবা কর" বলিয়া চলিয়া গেল।

তন্দ্রা ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী চিন্তার আজ্ঞা মত ডাক্তারের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহাকে নিদ্রিত করিয়া দিল।

অত্যধিক চিন্তা হইলে দেহে আপনা আপনি একটু অবসাদ আসে, এবং ঐ জন্য অনেকেরই ঐ সময় নিদ্রাও বেশী হইয়া থাকে। ডাক্তার ক্রমশঃ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। অনেকক্ষণ নিদ্রিত থাকার পর হঠাৎ জোরে ট্রেনটি নড়িয়া উঠায় ডাক্তারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন অপরাহ্ণ কাল।

সমস্ত দিন কিছুই না খাওয়ায় তাহার শরীর খুব দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। ডাক্তার দেখিলেন একটি খুব বড় ষ্টেশনে ট্রেন থামিয়াছে। জানালার মধ্য হইতে মুখ বাড়াইয়া প্লাটফরমের লণ্ঠনগুলির কাঁচের উপর রাণাঘাট জংসন লেখা দেখিয়া তিনি ট্রেন হইতে অবতরণ করিলেন।

এই সময় অনাহারে তাঁহার শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে ছিল। ডাক্তার সাহেব সম্পূর্ণ অনিচ্ছার সহিত যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন মুখে দিয়া, পিপাসা নিবারণার্থে এক গ্লাস বরফ মিশ্রিত লেমনেড ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু তাহাতেও পিপাসার শান্তি না হওয়ায় পুনরায় একগ্লাস সাদা জলে কিঞ্চিৎ বরফ দিয়া দিতে বলিলেন।

এই সময় একটি পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত মলিন বেশ ধারি যুবক ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, কখনও তাঁহার সম্মুখে দাড়াইয়া কখনও পশ্চাতে যাইবার চেষ্টায় অতি কষ্টে দক্ষিণ পা তুলিয়া বা মাটিতে ঘেঁষড়াইয়া, আড়ষ্ট জিহ্বায় অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিতে ও তৎসঙ্গে তাঁহার খাবারের দিকে এক এক বার লোলুপ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতে থাকায়, ডাক্তার সাহেব, তাঁহার উদ্বর্ত্ত সমুদয় খাবার গুলি, ও তৎসঙ্গে একটি টাকা ভিক্ষুকটীকে দিয়া তাহার জড়িত কণ্ঠের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

পরে বুকিং অফিসের ভিতর গিয়া এবার অধিক মূল্যে এক খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট খরিদ করিয়া ট্রেনের অপেক্ষায় ষ্টেসন প্লাটফরমে পায়চারি করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অংশ।

—o—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

——:*:——

পুস্তকারম্ভে যে দুইটি রমণীর কথোপকথন পাঠক পাঠিকা শুনিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয়া মহিলার পরিচয় আপনারা এখনও পান নাই। মাত্র এক স্থানে এই টুক্ অবগত হইয়াছেন, যে তিনি একজন পুলিশ কর্ম্মচারির স্ত্রী ও নাম বীণাপাণি। এক্ষণে আমরা বীণাপাণি দেবী সম্বন্ধে একটু পরিচয় দিব—

নদীয়া জেলার এলাকাভুক্ত শান্তিপুর গ্রামে শ্রীমান সচ্চিদানন্দ গোস্বামী ওরফে সচি বাবুর মাতামহ এবং বীণাপাণির পিতামহ, বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত এই দুই ব্রাহ্মণ নিজ নিজ পিতৃ পিতামহের বাস্তু ভিটায় বাস করিয়া আসিতেছিলেন।

বীণির পিতামহের অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল ছিল না, অতি শৈশব কালে পতিপ্রাণা স্ত্রী মালতী দেবীর সান্ত্বনার জন্য বীণাপাণিকে তাঁহার ক্রোড়ে দিয়া বীণির পিতা স্বর্গারোহণ করেন। মাতার যত্নে ও পিতামহ

পিতামহীর স্নেহাদরে বীণি পিতৃবিয়োগ জনিত শোক কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হইতেই বীণাপাণি দেবী মাতৃহারা হয়েন।

বীণি গরীবের ঘরের মেয়ে হইলেও দেখিতে খুব সুন্দরী ছিল। এমন কি পাড়ার মধ্যে তত্তুল্য সুরূপা কন্যা, কাহারও ঘরে না থাকায় পাড়ার অনেক বড়লোক গৃহিণীরা বীণিকে দেখিয়া তাহাদের কুরূপা বা কুৎসিতা কন্যার, কন্যা দর্শনান্তে অপছন্দ হওয়ায় দুই একটা ভাল পাত্র ফিরিয়া যাইতেছে বলিয়া দুঃখ করিত। এবং সময় সময় বীণাপাণির সহিত তুলনা দিতে গিয়া একটু হিংসাও করিত।

এইরূপে দারিদ্রের ক্রোড়ে বীণাপাণির সৌন্দর্য্য বুদ্ধির সহিত ক্রমশঃ শশীকলার ন্যায় দিন দিন তাহার অবয়ব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

সচ্চিদানন্দের পিতার কলিকাতায় শ্যামবাজার অঞ্চলে একখানি নাতিবৃহৎ বাড়ী ছিল। তাঁহার পিতা পল্লিগ্রাম হইতে চাকুরি উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া ক্রমে অবস্থার উন্নতি করিয়া এই ক্ষুদ্র বাড়ীখানি খরিদ করেন। পরে এদিক ওদিক আবশ্যকমত বাড়াইয়া, এক্ষণে একখানি বেশ সুন্দর ছোট ত্রিতল অট্টালিকায় পরিণত করিয়াছেন।

বাল্যকাল হইতেই সহরের কোলাহল সচির ভাল লাগিত না। স্কুলের গ্রীষ্মাবকাশ, পূজার বন্ধ বড় দিনের ছুটি বা তিন চারি দিনের যে কোন ছুটি পাইলেই সচি স্নেহময়ী মাতামহীর নিকট ছুটিয়া যাইত ও তথায় ছুটি শেষ করিয়া ফিরিত।

সচি মামার বাড়ী গিয়া কেবল যে মামাদেরই বাড়ীতে থাকিত তাহা নহে। চঞ্চল স্বভাব বশতঃ সচ্চিদানন্দের পাড়ায় সকল বাড়ীতেই

এক একবার চুমারা প্রাত্যহিক কার্য্য ছিল।

বাণিদের বাড়ী মামার বাড়ীর খুব নিকটে থাকায় তাহার ত' কথাই ছিল না। দিনের মধ্যে পাঁচবার সাতবার তথায় সচির যাওয়াই হ'চ্চে। বাণির পিতামহী সচিকে বড়ই ভাল বাসিতেন; এবং সচিও তাঁহার স্নেহের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে "দিদ্‌মা" বলিয়া ডাকিত, ও নিজের মাতামহী তুল্যই জ্ঞান ও ভক্তি করিত।

এই রকমে সর্ব্বদা যাতায়াতে বাণির সহিত সচ্চিদানন্দের খুব ভালবাসাবাসা হইতে লাগিল; এবং বাণিই সচির প্রধান খেলার সঙ্গিনী হইয়া দাঁড়াইল।

এই সময় তাহার বয়স আট পার হইয়া সবে নবম বর্ষে পা দিয়াছে ও সচ্চিদানন্দের এই তের বৎসর। বালক বালিকা সর্ব্বক্ষণ একসঙ্গে থাকায় ও খেলা ধূলা করায়, তাহাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এখন সচি কেবল খাবার সময় ও রাতে নিদ্রার সময় ব্যতীত প্রায় সর্ব্বক্ষণই বাণিদের বাড়ীতে। কখনও উভয়ে খেলার ঘর করিতেছে। কখনও বা একজন দুইটি নারিকেল মালার দাঁড়িপাল্লা প্রস্তুত ক'রে দোকান করে মুদি হ'য়ে ব'সে ধূলার চাউল, বালির চিনি, ছোট ছোট কাঁকরের সৈন্ধব লবণ প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছে। অপরে খোলামকুচির পয়সা দিয়া তাহা খরিদ করিয়া প্রাণে আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

কখনও বা বাণি ঘোমটা দিয়ে বোউ হ'য়ে বসে ভাতের ফেন্ গালিতে দিয়া তাড়াতাড়ি কচুপাতা ও দুর্ব্বাকুচন তরকারি রাঁধিতে ব্যস্ত। এদিকে সচি এসে, "ট্রেণের সময় হ'ল, এখনও তরকারি হ'লনা?

আমাকে আজ না খেয়েই আফিসে বেরুতে হ'ল দেখ্‌চি" বলিয়া সেই তরকারি রাঁধিবার মালার হাড়িটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নববধূ সাজে বীণি "এই হ'ল আর্‌কি" বলে তাড়াতাড়ি একটা কচুপাতার উপর ঐ ধূলার ভাত, এবং আধ কাঁচা তরকারি দিয়ে খাবার ঠাঁই করে দিল। সচি তাহার অধরাভ্যন্তর ও জিহ্বার সাহায্যে এক রকম শব্দ করিয়া যেন খাইতে লাগিল, ও তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ ক'রেই ছাতাটি বগলে নিয়ে অফিসে ছুটিল।

বীণির ঠাকুরমা এই সমস্ত দেখিতেন ও মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেন, এবং বলিতেন "হা ভগবান! এদের এই স্বামী স্ত্রীর অভিনয়টা যদি সত্য হয় তা' হ'লে কি সুখেরই হয়। নারায়ণ তুমি তাই করো।"

কখনও বা বীণি মাটির সন্দেশ, কাদার পায়েস প্রস্তুত করিয়া পাতা ঢাকা দিয়া রাখিত ও বৈকালে "একটু জল খাও" বলিয়া সচিকে সযত্নে খাইতে দিত।

আবার সময়ে সময়ে সচি তামাসা করিয়া বলিত "দূর ছাই এ' তরকারিটা পুড়িয়ে ফেলেছ" বলিয়া না খাইয়া উঠিয়া পড়িত; সে দিন বালিকার আর কিছুই ভাল লাগিত না। সমস্ত দিন কাঁদ কাঁদ মুখে মুখ ভারি করিয়া থাকিত। সচি নিজের মনে মনে হাসিয়া বলিত আজ বীণিকে খুব জব্দ ক'রেছি।

আবার হয় ত' সচি কোন সময়ে, এই অবস্থায় নববধূর মন যোগাইবার জন্য দুটি ফুল তুলে এ'নে বীণির ছোট্ট খোপাটিতে নিজ হস্তে গুজিয়া দিত।

এইরূপে শৈশবের এলা খেলা, ক্রমে কৈশরের প্রণয়ে পরিণত

হইল। সে প্রণয় পবিত্র, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক ও নির্ম্মল।

এক দিন বীণির পিতামহ বিরিঞ্চি লাহিড়ী সচির মাতামহের নিকট কথা প্রসঙ্গে উহাদের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—"যদি এই পিতৃ মাতৃহীন বালিকাটিকে আপনার জামাতা মহাশয়কে ব'লে তাঁহার চরণে স্থান দেওয়াইতে পারেন, তাহা হইলে গরীব ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা হয়।"

প্রস্তাব শুনিয়াই সচির মাতামহ মহাশয় একটু অগ্রাহ্য ভাবে "বসুন তামাক আনি" বলিয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে তুড়ি দিবার ছলে বাম হস্ত উঁচু করিয়া একটা মস্ত হাই তুলিয়া দুর্গা। দুর্গা! দুর্গতি-নাশিনী বলিতে বলিতে, বাহির হইতে যেন স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় এইরূপ গলায় গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"বলি আর শুনেছ গা, তোমার নাতির যে বিয়ে। দেখ দেখি ভিখিরী বামনটার আক্কেল, বলে কি না আমার নাতনির সঙ্গে তোমার নাতিটির বিবাহ দাও। বুড়ো মিন্সের মতিচ্ছন্ন ধরেছে, আরে রাম কহো। জামাতার নিকট এ প্রস্তাব কল্লে বোধ হয় গলা ধাক্কা খেতেন। ছেলে দুটো পাশ করেছে, আস্‌চে বছর কোন না আর একটা পাশ ক'র্‌বে। কল্‌কেতায় বাড়ী, অবস্থা ভাল, বাপের একই ছেলে; ও' অন্ততঃ দশ বার হাজার টাকা নিয়ে তবে বিয়ে কর্ত্তে ব'সবে। বামন কাল কি খাবে তার সংস্থান নেই। যজমান বাড়ী সেধে পেতে না আন্‌লে যার হাঁড়ি ঢন্‌ ঢন্‌, সে কিনা বড় লোকের ছেলের সঙ্গে, আমার নাতির সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করে, নারায়ণ মধুসূদন। হ'লই বা মেয়ে সুন্দরী, হাড়ি মুচির ঘরেও ওর চেয়ে সুন্দরী কন্যা আছে,

তাই বলেছি সেখানে বিয়ে দিতে হ'বে নাকি! দুর্গা দুর্গা।"

এই কথাগুলি বাড়ীর মধ্যে এত আস্তে আস্তে হইতেছিল যে বাহিরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তাহার এক অক্ষরও শুনিতে বাকি রহিল না। সচিও ছাতের উপর ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে তাহার আদ্যোপান্ত সমুদয় শুনিতে পাইল; ও মুখ মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতে লাগিল।

বৃদ্ধ শুধু স্ত্রীর নিকট পরিচয় দিয়াই সন্তুষ্ট না হইয়া আপন মনে "তোর বাপু এত সখ কেন? কাঙ্গালের ঘোড়ার রোগ কেন?" ইত্যাদি বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ হুকা হাতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন বীণির পিতামহ চলিয়া গিয়াছেন।

চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধের আরও রাগ হইল। তখন গজ্‌ গজ্‌ করিয়া "কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই, শাক খেয়ে শেষে শিকড় ধরে টান্‌বে। ভাব আছে বলে যে দেখ্‌চি মাথা কিনে নিতে চায়। সচির ওদের বাড়ী যাওয়াই বন্ধ কর্ত্তে হ'বে। হরিহে দীনবন্ধু।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ বাড়ীর মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সচির মাতামহ বীণির পিতামহকে গরীব বলিয়া উপেক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু সচি তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিল না। বাল্যের ভালবাসা বড়ই মধুর ও দৃঢ়, এ বন্ধন ছিন্ন করা খুব সহজ নহে।

দেখিতে দেখিতে সচ্চিদানন্দের বি, এ, পাশ হইয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পোষ্ট তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সচি বাবু পিতা মাতা ও মাতামহের অমতে বীণাপাণি দেবীকে বিবাহ করিয়া, সুন্দরী নববধূকে চাকরীস্থানে লইয়া গেলেন।

স্বপ্নদৃষ্টা

সচি পিতা মাতার অবাধ্য হইয়া যে অপরাধ করিল, তাহার ষোল-আনা শাস্তি ভোগ করিতে হইল বেচারি বীণাপাণিকে। তাহার আভাষ আমি কথঞ্চিৎ গ্রন্থারম্ভেই পাঠক পাঠিকাকে দিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—— :o: ——

আজ কয়েক দিন হইতে আমরা আনওয়ার আলির কোন খোঁজ খবর রাখি নাই। কোর্ট বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তবে উকিল সাহেবের দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় আদালতে সমান ভাবে কাষ্য চলিত বলিয়া, তাঁহার পূজার অবকাশটা অতি অল্পকাল স্থায়ী।

বন্ধুর আর কোনই সংবাদ আনওয়ার আলি কয়েক দিনের মধ্যে না পাওয়ায়, তাঁহার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া আছে। তিনি যে এখন কোথায় আছেন তাহাও আনওয়ার অবগত ছিলেন না।

আজ বিজয়া দশমী, হিন্দু বালক বালিকাদের আজ আনন্দের সীমা নাই। তাহারা উল্লাসে এবাড়ী ওবাড়ী প্রতিমা দর্শন করিয়া আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। চতুর্দ্দিকে শারদীয়া পূজার বাদ্য আজ সমস্ত দিন তোলপাড় করিয়া রাখিয়াছে, নূতন কাপড় নূতন জামা পরিয়া হিন্দু-বালক ও যুবক বৃন্দ, ছোট ভগ্নী বা কন্যার হাত ধরিয়া লইয়া বৈকালে বিসর্জ্জনের ঘটা দেখিতে চলিয়াছে।

আনওয়ারের মন আজ কি জানি কেন বড়ই বিষণ্ণ ও তৎসঙ্গে শরীরও খুব অবসন্ন। মন স্থির করিবার জন্য উকিল সাহেব উপরের

বারাণ্ডায় বসিয়া, এ বই সে বই পড়িবার চেষ্টা করিতেছেন ; কিছুই ভাল লাগিতেছে না। এমন সময় মালী পুরুষোত্তম একখানা পত্র দিয়া গেল।

পত্র খানার শিরনামা দেখিয়াই ডাক্তার সাহেবের হস্তাক্ষর চিনিলেন ; তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতেই তাঁহার বাহ্য জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইল।

"খুঁজে পেয়েও তোমার হস্তে সমর্পণ কর্ত্তে পারলাম না" এই কথার অর্থ কি ? তবে কি আমার স্বপ্ন-রাণী অপর স্থানে বাগদত্তা হইয়াছে ? না তাহাও ত' এই লেখা হইতে স্পষ্ট অনুমান করা যায় না। তবে কি তাহার পিতা মাতা আমার সহিত বিবাহ দিতে রাজি নন্। না হইবারই বা কারণ কি ? দ্বিতীয় পক্ষ বলিয়া ? না তাহা ত' হইতে পারে না। তাঁহারা ত' আমাকে দেখিয়াছেন।

এই মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তারের বিবাহের সময় ত' হাফেজ সাহেব ও তাঁহার পুত্রের সহিত আমার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তাঁরাত' আমার বয়সও জানেন। হাফেজ সাহেব আরও কথা প্রসঙ্গে আমার স্বর্গীয় পিতার সহিত তাঁহার খুব আলাপ পরিচয় ছিল তাহাও প্রকাশ করিলেন। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ বলিয়া একটা আপত্তি ত' হইতে পারে না। তবে এ "সমর্পণ কর্ত্তে পারিলাম নার" অর্থ কি ?

তার পর "মুখ দেখাইব না, প্রাণে আঘাত পেয়েছি" ইহারই বা মানে কি ? কি কারণে ডাক্তারের প্রাণে এত আঘাত লাগিল ? আর সর্ব্বশেষে "বিদায়" কথাটাই বা লেখা কেন ?

আনওয়ার আলি পত্র পাঠে আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। যতই ভাবিতে লাগিলেন, মন উত্তরোত্তর ক্রমশই খারাপ

হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার আজান শুনিয়া আনওয়ার হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা করিলেন; তাহাতেও প্রাণে শান্তি আনয়ন করিল না।

সন্ধ্যার পর নীচে নামিলেন। পূর্ব্ব বর্ণিত গোলাপ বাগানের পার্শ্ব-বর্ত্তী তাঁহার স্বহস্ত রচিত ক্রটন কুঞ্জের মধ্যে, তিনি সময় সময় বসিবার ও বিশ্রাম করিবার জন্য একটি মার্বেল প্রস্তরের সুন্দর বেদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আনওয়ার উহাতে উপবেশন পূর্ব্বক কুঞ্জ মধ্যস্থলে স্থিত নাতিবৃহৎ ম্যাগ্‌নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরার পুরু মসৃণ পাতার উপর দশমীর চন্দ্র কিরণের মধুর ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অসময়ে কুঞ্জমধ্যে মনুষ্যের আগমন শব্দ পাইয়া, কি মনে করিয়া ম্যাগ্‌নোলিয়ার ঘন পত্রের ঝোপের মধ্যস্থ বাসা হইতে ঘুঘু দম্পতী ঝট্‌-পট্‌ করিয়া উড়িয়া যাওয়ায়, আনওয়ার আলি মনে মনে বলিলেন—

কৈ এরাও ত' বিদেশী বর্জ্জন কত্তে পারেনি! নতুবা নিকটেই সম আকারের পত্র বিশিষ্ট দেশী সুন্দর নধর কাঁঠাল গাছটি থাকিতে, এ বিলাতি গাছের মধ্যে বাসা করিতে গেল কেন?

বন্ধুর পত্র ক্রমশঃ আনওয়ারের প্রাণের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন; মনে উদয় হইতে লাগিল যে আর বুঝি তিনি প্রাণের বন্ধু ডাক্তার সাহেবকে দেখিতে পাইবেন না।

সমস্ত রাত্রিটা আনওয়ারের অতি কষ্টে কাটিল। প্রভাতে উঠিয়াই আনওয়ার, একটি ডাক্তারের পিতার নিকট ও অপর একটি হাফেজ সাহেবের নামে, উত্তর পাইবার মূল্য সম্বলিত জরুরী টেলিগ্রাম

করিলেন

সাড়ে দশটার সময় দুই খানিরই উত্তর একত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাণ্ডুয়া হইতে এই ভাবে উত্তর আসিল "কি সর্ব্বনাশ! আমি কিছুই অবগত নহি, হোসেন ত' শ্বশুরালয়ে গিয়াছে।"

দ্বিতীয়টিতে লেখাছিল "ডাক্তার হঠাৎ নিরুদ্দেশ, তাহার স্ত্রী সাংঘাতিক পীড়িতা।"

তারবার্ত্তা দুইখানি পড়িয়া উকিল সাহেব অবাক্ হইয়া গেলেন। দ্বিতীয় টেলিগ্রামটিরই বেশী আলোচনা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন তাহার স্ত্রীর আবার কি হ'ল। আহা সে যে বড়ই পতিব্রতা; স্বামীর অদর্শনে কোন অমঙ্গল ঘটাইয়াছে।

নিশ্চয় বোধ হইতেছে সতী সাধ্বী স্ত্রী, হঠাৎ বিচ্ছেদ জনিত দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে অপারগ হইয়া, আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়া কঠিন পীড়িতা হইয়াছে। আর হঠাৎই বা নিরুদ্দেশ হইবার ডাক্তারের এমন কি কারণ হইল।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, আনওয়ার শেষে নিজেকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিল ও বলিতে লাগিল—এই সমস্ত অনর্থের আমিই মূল। আমার জন্যই দুইটি সুখী পরিবারের এ দারুণ কষ্ট ভোগ। হায়! কেন আমি মরিতে ডাক্তারকে এই সমস্ত কথা বলেছিলাম। এইরূপ নানা প্রকার অনুতাপানলে আনওয়ার দগ্ধ হইতে লাগিল।

শেষে তাঁহার নিজের ও ডাক্তারের যে যেখানে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব জানা শুনা ছিল, সকলের নিকট এক একখানা পত্র লিখিয়া ডাকে ফেলিতে দিলেন।

সময় কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। তোমার কষ্ট হউক বা তুমি সুখে থাক, সময় সে বিষয়ে কোন চিন্তাই করিবে না। সে যেমন দিনের পর দিন আনয়ন করিতেছে, প্রাতে সূর্য্য উদিত করিয়া আবার সন্ধ্যায় তাহাকে অস্তে দিতেছে, আবার পর দিবস আনয়ন পূর্ব্বক তাহাতেও ঐ সমান ক্রীড়া করিতেছে; সেই মতই করিতে থাকিল।

সময়ের কার্য্য সেই একই ভাবে চলিতে লাগিল। ক্রমে আনওয়ার আলিও তাহার লেখা সকল পত্রগুলিরই উত্তর পাইলেন। ডাক্তার সম্বন্ধে কোনই সন্ধান কেহ দিতে পারিল না। দারুণ মনঃকষ্ট ও অশান্তির সহিত আনওয়ারের দিন কাটিতে লাগিল।

শেষে ভগ্নী হাসিনাকে তাহার চারি বৎসর বয়সের সুকুমার পুত্রসহ নিজ বাড়ীতে আনাইলেন। এই সময়ে আনওয়ার আলির ফৌজদারি কোর্টও খুলিল, এবং কোর্টের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি কথঞ্চিৎ অন্যমনা হইতে পারিলেন।
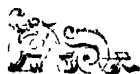
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—— :o: ——

বেলা সাড়ে পাঁচটা, এরই মধ্যে সন্ধ্যা বোধ হইতেছে। মেঘে সমস্ত আকাশটা ছাইয়া ফেলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সামান্য বৃষ্টিও পড়িতেছে আবার ছাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু মেঘ সমান ভাবে আকাশের গায়ে মৌরসী পাট্টা লইয়া বসিয়া আছে; কিম্বা সূর্য্যের সঙ্গে বিবাদ করিয়া এইরূপ করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া যে বৃষ্টি হইতেছে তাহারও জোর নাই। খুব ক্ষুদ্র বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে মাত্র। মনে হ'চ্চে যেন কে উপর থেকে চালুনি দিয়ে ঝির্ ঝির্ করে খানিকটা বালি চেলে দিলে।

এই মেঘ বাদলে, খোকা হয় ত' ভিজে ভিজে কোথায় খেলাচ্চে এই আশঙ্কায় "সে দুষ্টটা কোথায় গেল?" বলিতে বলিতে একটি যুবতী উপরে আসিয়া দেখিল, একটা চার পেয়ের সহিত খোকা হাতাহাতি বাধিয়েছে।

চারি বৎসর বয়স্ক যেমন নধর কান্তি ফুটফুটে খোকাটি, তেমনি একটি নাদুস্ নুদুস্ ধবধবে সাদা বিড়াল ছানাকে লইয়া, এত তন্ময় হইয়া খেলা করিতেছিল যে, মাতার আগমন একটুও টের পায় নাই।

খাটের গদির উপর নিজের ছোট বালিশ ও ফুল পাতা তোলা

সেলায়ের কাঁথা বিছাইয়া, বিড়াল ছানাটিকে তাহার উপর শোয়াইয়া, তাহার পার্শ্বে শুধু বিছানায় আপনি শুইয়া, রাজ্যের গল্প আরম্ভ করিয়াছে।

"তুই দুদ ভাল বাচিচ্, না মেতাই ? দুদ, দূল বোকা দুদেল ছল গলায় বাধে যে। আমি মেতাই ভাল বাচি, সন্দেচ ভাল বাচি, গজা ভাল বাচি। আচ্ছা তুই দিম ভাল বাচিচ্ না মাচ ? দিম ? তবে মাচেল কাঁতা খাচ্ কেন ? আমি ত' দিম ভাল বাচি, দিমেল ভেতল কেমন কুচুম থাকে ; ছেই যে দেকিচ্নে ? গোল গোল গুলিল মত। আমি তাই বদ্দ ভাল বাচি।

মাচ আমি খাই না, বাবা গো কাঁতা। তুই কি কলে মাচ খাচ্লে পুচি ? আচ্ছা তোল গলায় কাঁতা ফুত্লে কে বাল কলে দেয় ? তোল মা ? তোল মা কোতায় আচে ? দেচে ? মাল জন্নি কাঁদিচ্ না ?

অ, আ পলতে পালিচ ? আচ্চা বই নিয়ে আচি দালা, না পাল্লে মালব কিন্তু।"

খোকা দৌড়িয়া গিয়া পাশের ঘর থেকে একখানা ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, আর সরু বেতের একটা ছড়ি আনিয়া বিড়াল ছানাটিকে পড়াইতে বসিল। তাহার মাতা একটু আড়ালে থাকিয়া স্মিতমুখে সরল শিশুর জীবন্ত খেলনা লইয়া ক্রীড়া দেখিতেছিলেন। গদিতে শুইয়া আরাম পাওয়ায় বিড়াল ছানাটি চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। বালক সজোরে বেত দ্বারা বিছানায় একটি আঘাত করিয়া বলিল।

"পলবাল্ ভয়ে ঘুমুন হচ্চে দেখ্চি, বল অ" বিড়ালটি বেতের শব্দে ভয় পাইয়া উঠিয়া বসিয়া, স্বাভাবিক সুরে ম্যাও করিয়া, চার হাত পা

লম্বা করিয়া ও নিজেও সেই সঙ্গে দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হইয়া একটি প্রকাণ্ড হাই তুলিল।

খোকা অমনি ধমক দিয়া বলিল "ম নয় লে বোকা, অ, অ, অ, ছুন্‌তে পাচ্‌না, তোল চোক নেই, চোকে ছুন্‌তে পাওনা।"

আর হাসি চাপিতে না পারিয়া মাতা হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন "কে চোখে শুন্‌তে পায় না যাদু?"

পুত্র গম্ভীর মুখে বলিল "এই পুচি ; মা ও মোতে অ বল্‌তে পালে না, কেন মা? আমিত পালি, ও কিছু বুদ্দি ছেকেনি, না মা?"

মাতা পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "না বাবা ওরা কি কথা ব'ল্‌তে পারে, তাই অ বল্‌তে পার্‌বে?"

বালক তখনই মায়ের গলা জড়াইয়া বলিল, "আপনি জানেন না বুঝি, একতু একতু কথা বল্‌তে ছিকেচে, আমি ওকে অ পল্‌তে বল্লুম ও বল্লে "ম"। মায়েল ছামনে আল এক বাল বল্‌ত পুচি" বলিয়াই পুসির লেজে এক টান দিল। বেচারা পুসিও ম্যাও ম্যাও করিতে করিতে দৌড়িয়া পলায়ন করিল।

পুসির পলায়ন দেখিয়া বালক খিল খিল করিয়া হাসিয়া লুটিপুটি খাইতে লাগিল। পুত্রের আনন্দ মিশ্রিত হাসিতে মাতারও হাস্য সম্বরণ করা দায় হইল, তিনিও হাসিয়া ফেলিলেন।

এমন সময় আনওয়ার আলি গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন "মায়ে বেটায় এত হাসির ঘটা কেনরে হাসিনা?"

মামার সাড়া পেয়ে খোকা দৌড়ে তাঁহার নিকট গেল, এবং পুসির পড়বার ও মায়ের সাম্‌নে কথা বলবার ভয়ে, পুসি কেমন করে দৌড়ে

পালিয়েছিল ; হাসিতে হাসিতে সেই রকম ভঙ্গি করিয়া দৌড়িয়া মামাকে দেখাইতে লাগিল।

আনওয়ার আসল কথাটা কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারায়, হাসিনাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "খোকা বুঝি ওর পুসিকে ঐ বেত দিয়ে আদর করছিল ?"

হাসিনা বলিলেন শুধু কি তাই, কত সুখ দুঃখের কথা, ওর পুসির সঙ্গে হচ্ছিল। আবাব পড়া শুনতে পায়নি বলে ওকে ধমক দিয়ে বলছিল "তুই চখে শুনতে পাস্না।"

আনওয়ার আলি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, ও সস্নেহে বালকের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন "হ্যাগা মামা, চোখ দিয়ে সবাই শুনতে পায় নাকি ?"

মামার প্রশ্নের ভাবে নিজের ভুল অনুভব করিয়া, ক্ষুণ্ণ স্বরে বালক জিজ্ঞাসা করিল "চোখে ছুদ্ধু দেখ্তে পায়, ছুন্তে পায় না, তবে কিছে শুন্তে পায় মামা ?"

মামা বলিলেন, তুমি চোক বন্ধ কর আমি তোমায় বুঝিয়ে দিচ্চি। খোকা তৎক্ষণাৎ তাহার মামার আদেশ পালন করিল।

আনওয়ার আলি বলিলেন "এই যে বেরাল ছানা আবার—" কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই খোকা "কই কই প্যুচ কই" বলিয়া চক্ষু খুলিয়া হাসিয়া উঠিল।

মামাও হাসিলেন। বলিলেন "চোক বুজিয়ে কি করে আমার কথা শুনতে পেলে ? আচ্ছা এবার কাণ বন্ধ কর, দুটি আঙ্গুল দুকাণের মধ্যে খুব জোরে ভরে দিয়ে থাক ; একটুও ফাঁক করো না।"

শান্ত খোকা তাহাই করিল।

আনওয়ার আলি বলিলেন "খোকা তোমার পুসিকে এক আছাড়ে মেরে ফেল্‌ব।"

বেচারি খোকা কিছুই শুন্‌তে পেলেনা, কেবল কালো কালো দুটি ডাগর ডাগর চক্ষু মামার মুখের উপর করিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

আনওয়ার আলি তাহার মাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "হাসিনা বিড়ালটাকে ধরত' ওকে আমি আজ জবাই কর্‌ব।"

খোকার মুখে কথা নাই, পুর্ব্বের ন্যায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে মাত্র।

পুত্রের কাণ হইতে হাত সরাইয়া দিয়া মাতা তখন বল্লেন, "তোমার মামা কি বল্লেন শুন্‌তে পেয়েছ?"

পুত্র বিস্মিত ভাবে উত্তর দিল, "কই মা, মামাত' আমাকে কিছু বলেননি।"

স্নেহময় কণ্ঠে মাতা বলিলেন, "বলেননি কিগো, তোমার পুসিকে আছড়ে মারতে, কেটে ফেল্‌তে যাচ্ছিলেন যে।"

অম্‌নি ঠোঁট দুটি ফুলয়ে কাঁদ কাঁদ মুখে খোকা বলিল, "আমাল পুচি কি কলেচে, তাই মেলে ফেল্‌বেন, এঁ্যা মাল্‌তে দেবে বৈকি।"

মাতা হাসি চাপিয়া বলিলেন, "সত্যই কি মারতেন, তুমি শুন্‌তে পাও কিনা তাই তোমাকে বোঝা'বার জন্যে বল্লেন।'

ছল ছল নেত্রে বালক বলিল, "ভালি দুত্তু মামা. আমাল কাণে খুব জোল কলে আঙ্গুল দিতে বলে, আমাল পুসি কচিকে মাল্‌বাল

লেগে ছত্ ক্বত্ কলা হচ্চিল হাঁা।"

আনওয়ার আলি কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন, "কেন বাবা, তুমিত আমার মুখের দিকে বড় বড় চোক করে চেয়ে ছিলে; তবে আমি যা বল্লাম শুনতে পেলেনা কেন? আর আগেত চোক বন্ধ করেও আমার কথা শুনতে পেয়েছিলে। তোমার পুসিকে মারব কেন, বাপরে ও আমার খোকা মামার শ্বশুর, ওকে মাছের মুড়ো খেতে দিব। এই-বার খুসী হয়েছ?

আচ্ছা এইবার বলদেখি, সকলে কি দিয়ে শুনতে পায়; চোখে না কাণে?"

আহ্লাদে মুক্তা পংক্তির ন্যায় শুভ্র দুপাটি দন্ত বাহির করিয়া, গাল ভরা হাসি হাসিয়া, মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া খোকা গদগদ কণ্ঠে বলিল— "আমি বুঝেচি, থিক্ বুঝেচি; কাণে ছুনতে পায় গো, কাণে। আমাল বুদ্ধি ছুদ্ধি নেই বত্তে।"

কচিমুখে বুদ্ধির গৌরব শুনিয়া মামা ও মাতা উভয়েই স্নেহের হাসি হাসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—— :০: ——

নির্জ্জন পর্ব্বতোপরি সবুজ মখমল মণ্ডিত তুলার তোষকের ন্যায় সুকোমল পার্ব্বতীয় শৈবাল মিশ্রিত ঘাসের উপর, যুবক দক্ষিণ হস্তে কপোল ন্যস্ত করিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গভীর চিন্তামগ্ন। যুবকের মুখখানি মলিন হইলেও তাহা স্বাভাবিক সুন্দর। তাহার উজ্জ্বল চক্ষু, প্রশস্ত ললাট এবং বক্ষস্থল দেখিলে, যুবককে ভবঘুরে বলিয়া কেহ অনুমান করিতে পারে না।

কে তুমি হতভাগা যুবক? অকস্মাৎ নক্ষত্রের ন্যায়, এখানে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া চিন্তামগ্ন রহিয়াছ। অথবা কাহার অভিশাপে স্নেহ-ময়ী জননীর বক্ষপঞ্জর বিচ্ছেদের নিষ্ঠুর লগুড়াঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, নির্ব্বাক গিরিশৃঙ্গের পাষাণময় ক্রোড়ে প্রাণে শান্তি পাইবার মানসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ? কিম্বা আত্মীয় অনাত্মীয়গণের নির্দ্দয় ব্যবহারে জর্জ্জরিত হৃদয় খানি লইয়া ঝরণার শীতল জলে দেহ প্রাণ ঠাণ্ডা করিতে আসিয়া, তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া নির্ব্বাক বসিয়া আছ?

তবে সত্যই কি তুমি হতভাগা! তোমার সুকুমার সুন্দর অবয়ব ত' তাহার সাক্ষী দিতেছে না। ভুল ভুল সম্পূর্ণ ভুল; যুবক তুমিই

যথার্থ ভাগ্যবান। তোমার মত ত্যাগী, স্বার্থশূন্য মহাপুরুষ কয়টি আছে? তোমার ন্যায় উদার প্রাণ যদি সকলের হইত, তাহা হইলে সংসার হইতে পাপ নাম লুপ্ত হইয়া, এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইত!"

বন্ধুকে সুখী করিবার জন্য নিজের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, ফকির বেশে অনাহারে অনিদ্রায় বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে গুহায় গুহায়, ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। ধন্য তুমি ত্যাগী যুবক, তুমিই ধন্য। তোমার ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধু জগতে দুর্লভ।

পার্ব্বতীয় নর নারীগণ নিম্নে পর্ব্বত গাত্রে চা বাগানে কার্য্য করিতেছে; উপর হইতে তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র চালিত ক্রীড়া পুত্তলি বলিয়া অনুমিত হয়।

যে উচু টিপিটির উপর উদাসীন যুবক অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শুইয়া বা কখনও বসিয়া আছেন; সেই স্থান হইতে প্রায় শত হস্ত নিম্নে পাহাড়ীয়া রমণীগণ ছোট ছোট পনি ও ডংকির পৃষ্টসংলগ্ন ক্ষুদ্র ঘেরার মধ্যে, যাত্রিদিগের ছোট ছেলেমেয়েদিগকে আরোহণ করাইয়া ঐ ঘোড়া বা গাধার লাগাম ধরিয়া, আনন্দে শিস দিতে দিতে ও অবসর মত চুরোটক্ সেরনের ধূম বাহির করিতে করিতে, বৈকালিক ভ্রমণে লইয়া চলিয়াছে। কদাচ দুই একটা রিক্সা বা ডাণ্ডি লইয়া, ভীমকায় পাহাড়িয়াগণ ফোঁস ফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে দৌড়িতেছে।

যুবকের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া হু হু শব্দে গর্জ্জন করিতে করিতে ফেনযুক্ত ঝরণার পানি, কঠিন পর্ব্বত গাত্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আবার নিম্নের বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া কতক বা

বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধে উঠিয়া বাতাসের সহিত মিশিয়া যাইতেছে; অবশিষ্ট হুড় হুড় শব্দে নিম্নে নামিয়া চলিয়াছে।

মধ্যে মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্টা আসিয়া, যুবকের উষ্ণ মস্তক শীতল করিবার চেষ্টা করিতেছে; এমন সময় দুষ্ট মেঘগুলি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ঊর্দ্ধে সম্মুখে, পশ্চাতে নিম্নে সর্ব্বত্র মেঘময় হইয়া পড়িল। মেঘ পর্ব্বতের সমুদয় দৃশ্য ঢাকিয়া ফেলিল। তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন যুবক জন মানব শূন্য সমুদ্রের মধ্যে একা একটি দ্বীপে উপবিষ্ট।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মেঘের কোমল আবরণটি সরাইয়া দিয়া, কঠিন গিরিশৃঙ্গ নিজমূর্ত্তি ধারণে আবার দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইল।

কঠোরতার সহিত কোমলতার সম্মিলন বড়ই মধুর। কঠিন প্রস্তরময় গিরিগাত্র ভেদ করিয়া, কোমল স্নিগ্ধ জল-প্রপাতের বারি পতন দেখিলে কাহার না নয়নে তৃপ্তি হয়। তাই বীর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার অধিকতর সুন্দর; গাঢ় প্রণয়ে মধ্যে মধ্যে ক্রোধের আবির্ভাব, যেন প্রণয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে; কঠোর বিচ্ছেদের পার্শ্বে মিলন প্রণয়ের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলে। শ্রবণ বধিরকারী প্রচণ্ড অশনি পাতের সঙ্গে সঙ্গে নব বারিধারার সমাগম অতীব স্নিগ্ধকর।

অন্নপূর্ণার স্নেহ করুণ মূর্ত্তি, শিবের রুদ্র মূর্ত্তির বামে স্থাপিত না থাকিলে জিনিষটা অত সুন্দর দেখাইত না। বিকট ঘৃণিত চেহারার লোকের মুখ নিসৃত মধুর সঙ্গীত তরঙ্গ, তাহার কুদর্শন চেহারাটিকেও

সুন্দর করিয়া তুলে। আবার কঠিন যুক্তাক্ষরের বানান অভ্যাসকারী শিশুর সম্মুখে, তাহার দ্বিতীয় ভাগের পার্শ্বে একটি বাটিতে, রসে অর্দ্ধাবয়ব নিমজ্জিত দুইটি রসগোল্লা থাকিলে, যুক্তাক্ষরের কাঠিন্যও মধুর এবং সহজ হইয়া উঠে।

ঊর্দ্ধে, নিম্নে, বামে, দক্ষিণে চতুর্দ্দিকস্থ কঠিন প্রস্তর গাত্রে, তুলার ন্যায় সুকোমল মেঘ রাশি জমিয়া, উদাসীনের অন্তরে তৃপ্তি উৎপাদন করিতে লাগিল।

বোধ হয় অতিথির ম্লান মুখ দেখিয়া, মেঘগুলি সহানুভূতি দেখাইতে ছুটিয়া আসিতেছে; এবং তাহার দুঃখে গলিয়া গিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। আবার সময়ে সময়ে অনাদরের অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া ফিরিয়া যাইতেছে।

সিগারেট খাইয়া যেমন ধোঁয়া ছাড়ে, সেই পরিমাণ শুভ্র ধূম্রের ন্যায় যেন পর্ব্বত গাত্র হইতে ধূম্র বাহির হইয়া, ধীরে ধীরে কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে পুঞ্জীকৃত ভাবে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া, রাশি রাশি তুলার ভাব ধারণে, ইচ্ছামত জমি অধিকার করিয়া তদুপরি স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে। আহা! সে শোভা উপর হইতে দেখিতে কি সুন্দর, যেন শত শত লেপের তুলা ধুনুরিগণ এই মাত্র ধুনিয়া রাখিয়া গেল।

উপরে বসিয়া নিম্নে এই অপরূপ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ইচ্ছা হয়, এখান হইতে ঐ তুলা রাশির উপর লাফাইয়া পড়িয়া একবার প্রাণ ভরিয়া গড়াগড়ি দেই।

উদ্‌ভ্রান্ত যুবক, এমন তৃপ্তিকর মন প্রাণ মুগ্ধকর দৃশ্য উপেক্ষা করিয়া দূরে, বহুদূরে কোন্ রাজ্যে, কাহার উদ্দেশ্যে যেন দুটি আঁখি,

বোধ হয় প্রাণ পাখীটিকেও পাঠাইয়া দিয়া, কেবল শ্রান্ত ক্লান্ত অসার দেহ খানি মাত্র, গিরিশৃঙ্গে উপহার দান স্বরূপ রাখিয়া দিয়াছে !

যুবক তোমার হৃদয় ফলকে যে সৌন্দর্য্য আঁকা আছে, তাহার অপেক্ষা কোন সৌন্দর্য্যই সুন্দর নহে। তবে কেন এখানে বৃথা কষ্ট ভোগ কর? এখানে তোমার মনস্থির হইবে না। এ দৃশ্যের সাধ্য কি যে তোমাকে মুগ্ধ করিতে পারে !

যাহার জন্য চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, যাহার বিরহে একটী সরল বালিকার কোমল প্রাণ, ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে। যাহাকে খুজিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত তাহার আত্মীয় ও বন্ধুগণ, চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি ও প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও, কোনই সন্ধান করিতে পারিতেছে না; সেই ত্যাগী মহাপুরুষ আহম্মদ হোসেন আজ হিমালয়ের পর্ব্বত শিখরে বসিয়া গভীর ধ্যানমগ্ন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

——:*:——

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে পশ্চিম গগন গোধূলির লোহিতাভায় আলোকিত হইয়া এক অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। হিন্দু রমণীগণ কলসী কক্ষে ঘোমটা টানিয়া ত্রস্ত পদে গৃহে ফিরিতেছে। রাখাল বালকগণ বাড়ি হাতে, গো মহিষের পাল তাড়াইতে তাড়াইতে অলসভাবে একটি গানের সুর ধরিয়া বাড়ী মুখে অগ্রসর হইতেছে। দুই একটি কাক পক্ষী আহার অন্বেষণে এখনও নূতন চষিয়া যাওয়া ক্ষেত্রের উপর লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছে।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলিল, দূরের বড় বড় গাছ গুলি মৌন ব্রতধারী যোগীর ন্যায় ক্বচিৎ সামান্য পত্র কম্পন দ্বারা, পরস্পর পরস্পরের যুগ যুগান্তের সুখ দুঃখ কাহিনী জ্ঞাপন করিতেছে।

এই সময় ছাদের এককোণে কার্ণিশের উপর উদ্‌ভ্রান্তভাবে বসিয়া মোমেনা ক্ষুদ্র একখানি ফটো হাতে লইয়া অনিমেষ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া আছে। মুক্তার ন্যায় কয়েকটি অশ্রু বিন্দু তাহার গোলাপী আভাযুক্ত গণ্ড বহিয়া বক্ষ ভিজাইয়া দিল।

স্বপ্নদৃষ্টা

ছবিখানি কখনও বুকে লাগাইতেছে, কখনও মাথায় রাখিতেছে আবার হাতে করিয়া মুগ্ধের ন্যায় তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেছে। এইরূপ দেখিতে দেখিতে যখন চোখের জলে দৃষ্টি রোধ হইয়া আসিল, তখন বিরক্ত ভাবে অঞ্চল প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া বুক ভাঙ্গা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হায়, তুইও আমার বাদ সাধ্‌লি! কাঁদবার ত' অনেক সময় আছে; এখন নিরিবিলি আমায় এ চাঁদ মুখটা একবার ভাল করে দে'খতে দে। ওঃ! আজ কত দিন তোমায় দেখি নাই নাথ! প্রায় দুই মাস তুমি নিরুদ্দেশ, এই দুই মাস যে আমার কাছে দুই যুগের চেয়েও ঢের বেশী।

আর পারি না নাথ, আর আমার ত' সহ্য হয় না। মৃত্যু, সেও আমার বাঞ্ছনীয় নয়। একবার না দেখে তো আমি মরতে পা'রব না। একবার তোমার মুখে, "মুমি তোমার উপর ত' আমি রাগ করি নাই" না শুনে মলেও ত' আমি শান্তি পা'ব না।

যদি তুমি একটিবার দেখা দিয়ে, কেবল বলে যেতে যে আমার উপর তুমি রাগ কর নাই; তা হ'লে আমার মৃত্যু কি সুখেরই হ'ত। তা'কি আমার এ পোড়া অদৃষ্টে হ'বে?

ও'গো একবার, কেবল একটিবার দেখা দাও, আর একবার বল যে "মোমেনা তোর উপর আমি রাগ করি নাই" আমি আর কিছুই চাহি না। জীবনে আমার আর কোন ভিক্ষা নাই, মরণেও না।"

অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় অন্ধকার হইয়া আসিল, সীমাহীন ঘন অন্ধকারের দিকে চাহিয়া মোমেনা নিজ অবশ পদদ্বয় কোন রকমে টানিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং শুইয়া পড়িয়া

মস্তকের যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল।

ঝি আমিরণ্ হ্যারিকেন জ্বালিয়া ঘরে রাখিতে আসিয়া মোমেনার অবস্থা দেখিয়া তাহার অসুস্থতা হৃদয়ঙ্গম করিল। কিন্তু ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। কারণ ডাক্তারের পরামর্শ মতে কর্ত্তার কঠিন নিষেধ ছিল যে, নার্শ ভিন্ন কেহ মোমেনার সহিত বেশী কথা বার্ত্তা না কহে। বা তাহার যাহাতে সামান্য মানসিক উত্তেজনা হয়, এমন কোন কার্য্য তাহার সম্মুখে না করে।

এই কারণেই অত্যধিক মাহিনা স্বীকারে, ডাক্তার সাহেবের প্রেরিত একজন ভাল লেখা পড়া জানা নেটিভ খৃষ্টান যুবতী নার্শকে হাফেজ সাহেব, কন্যার সখীরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আমিরণ্ ব্যস্ত ভাবে নীচে নামিয়া গিয়া প্রভুপত্নী সকাশে সমস্ত নিবেদন করিল।

মাতা তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গিয়া দেখিলেন, কন্যা শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, এবং শিরোপীড়ায় বেকরার। মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন গাও খুব গরম।

নার্শ সে দিন নিজের কার্য্যে, পর দিন বেলা ১০টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিবে বলিয়া বহরমপুরে গিয়া ছিল। সে কারণ সমস্ত রাত্রি মাতা কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া জাগিয়াই কাটাইলেন। এক প্রহর রাত্রি থাকিতে হাফেজ সাহেবের অনুমতি ক্রমে ধাত্রীকে আনিবার জন্য সহরে লোক ছুটিল।

প্রাতে নার্শ সমভিব্যাহারে ডাক্তার সাহেব আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। তিনিই এই ধাত্রীটিকে পছন্দ করিয়া মোমেনার সেবায় নিযুক্ত

করিয়াছিলেন বলিয়া ধাত্রী রাত্রিকালে রোগিণীকে ছাড়িয়া যাওয়ায় ডাক্তার সাহেব তাহাকে একটু স্নেহ মিশ্রিত মৃদু ভৎর্সনা করিলেন।

ডাক্তার সাহেব মস্তকে ইউডিকোলনের জলপটি সর্ব্বক্ষণ লাগাইয়া রাখিতে বলিয়া, ঔষধের ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া দিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলেন। এবং যাইবার কালে নার্শটিকে রোগিণীকে ভাল ভাল গল্প শুনাইতে, ও যাহাতে তাহার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে এইরূপ কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া গেলেন।

ধাত্রীর সেবায় ও ঔষধের গুণে, মোমেনা ক্রমশঃ আরোগ্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু নির্জ্জনতা নিবন্ধন স্বামীর চিন্তা তাহাকে অধিক মাত্রায় বিব্রত করিতে আরম্ভ করিল।

মানুষ কাজে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে, শোক দুঃখ ভুলিতে পারে। একেবারেই যে ভুলিয়া যায় সে কথা বলি না। তবে সর্ব্বদা কর্ম্ম কোলাহলের মাঝে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিতে পারিলে, নিশ্চয় চিন্তার হাত হইতে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়।

নির্জ্জন প্রিয় চিন্তা মানবকে নির্জ্জন পাইলেই, তাহার সঙ্গে বেশী করে বন্ধুত্ব আরম্ভ করে। এবং সেই দুরন্তই শেষে কুস্তিতে পরিণত হয়। তখন ধীরে ধীরে তাহাকে নিজ অনলে দগ্ধীভূত করিয়া তাহার ইহ জীবনের শেষ করিয়া, চিন্তার পরপারে পাঠাইয়া দেয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

মোমেনার শিয়রে একখানা চেয়ারে বসিয়া নার্শ তাহার মাথায় ইউডিকোলনের পটি দিতেছে, আর রোগিণী বাহিরের নূতন সূর্য্য কিরণের দিকে চাহিয়া, নিস্তব্ধ ভাবে শুইয়া আছে।

নার্শ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মাথার যন্ত্রণা এখন কি রকম বোধ হচ্ছে?" মৃদুস্বরে মোমেনা উত্তর করিল "একটু ভাল।"

তখন উপাধানের নীচে হইতে থার্ম্মোমিটার বাহির করিয়া, "একবার জ্বরটা দেখি" বলিয়া ধাত্রী ঐ তাপমান যন্ত্রটী ঝাড়িয়া, নিজের হাত ঘড়িটী দেখিয়া লইলেন; এবং মোমেনার ব্লাউজের দুইটী বোতাম খুলিয়া, তন্মধ্যে হাত দিয়া জ্বর পরীক্ষার যন্ত্রটী তাহার বগলে লাগাইয়া দিলেন।

তিন মিনিট পরে আবার যন্ত্রটীকে টানিয়া বাহির করিয়া, দৃষ্টি পূর্ব্বক মনে মনে "একশত একের সামান্য উপরে" বলিয়া পার্শ্বস্থিত কাগজে টুকি লিখিয়া রাখিলেন।

রাত্রে মোমেনার জ্বর ১০৩° এর উপরে উঠিয়াছিল, এক্ষণে অনেকটা কম দেখিয়া নার্শের চক্ষে আনন্দ চিহ্ন প্রকটিত হইল ও তিনি

একদাগ ঔষধ ঢালিয়া রোগিণীকে খাওয়াইয়া দিলেন, তারপর আবার একটী শুভ্র ন্যাকড়া ভিজাইয়া, পুরাতনটি উঠাইয়া লইয়া মোমেনার কপালের উপর নূতনটী লাগাইয়া দিলেন ও পূর্ব্বকথিত চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক রোগিণীর মস্তকে আস্তে আস্তে বাতাস করিতে লাগিলেন।

অল্প হাসিয়া মোমেনা বলিল, "আমার মাথাটা এখন বেশ হাল্কা বোধ হচ্চে, আর হাওয়া করবার দরকার নেই ; — তার চেয়ে আপনি বরং একটা ভাল গল্প বা আপনার বিদেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলুন।"

ধাত্রী হাসিয়া বলিল "আমি আর কি গল্পই বা জানি, যে আপনি আমার গল্প শুনতে চাচ্চেন ; আপনি নিজের মনের গল্প নিয়েই ব্যস্ত, তা' পরের গল্প আর কি শুন্‌বেন বলুন ? আর ভ্রমণ কাহিনী, আমার সেটিও' সীমাবদ্ধ। অসীম ইউরোপ খণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণকারির স্ত্রীর নিকট সামান্য কয়েকটী গ্রাম ভ্রমণের গল্প বলিতে যাওয়া কি আমার ধৃষ্টতা নয় ?"

মোমেনা কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহার মাতা রশীদাকে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নার্শ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গৃহিনী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ব'সনা মা তা'তে দোষ কি !"

"ক্ষমা করুন, আপনি দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন, আর আমি চেয়ারে ব'সব" বলিয়া ধাত্রী নিজের হাল্কা কেদারা খানি একহাতে ধরিয়া একটু এগিয়ে দিল।

"আচ্ছা আমরা বসচি" বলিয়া তিনি কন্যার শয্যা প্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। ধাত্রীও পূর্ব্বস্থানে বসিল, এবং রশীদা জ্যেষ্ঠার পদপ্রান্তে

উপবেশন পূর্ব্বক তাহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

গৃহিণী পার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া, কন্যার রুক্ষ চুলগুলি কপাল হইতে সরাইয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন। "এখন কেমন আছ মা?"

মোমেনা মাতার হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া, হাসি মুখে বলিল "আম্মাজান ভাল আছি।"

"ক্ষিদে পেয়েছে? পরশু রাত থেকে পানি ছাড়া ত' আর কিছুই পেটে যায় নি'। অমন লাল টুকটুকে ঠোঁট দু'খানি শুকিয়ে কাল হ'য়ে গিয়েছে।"

মোমেনা মাতার আঙ্গুলের নখ খুঁটীতে খুঁটীতে বলিল "ক্ষিদে ত' একটুও পায় না আম্মা, খালি পেয়াছ লা'গছে।"

"সারাক্ষণই ত' পানি খাচ্চ মা, এখন আর পানি খেয়ে কাজ নেই; একটু বেদানার রস দেই তাই খাও, লক্ষ্মী মা আমার।"

কন্যাকে নীরব দেখিয়া তাহার চিবুকে হাত দিয়া, আদর মাখা কণ্ঠে মাতা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন "রাগ হ'ল বুঝি, আচ্ছা তুমি না হয় আগে পানি খাও, তার পর বেদানার রস খাবে।"

মোমেনা হাসি চাপিয়া ছোট্ট করিয়া বলিল "দিন।"

তখন মাতা হাসিয়া আবার বলিলেন "এই দেখ পানি খাবার নাম শুনে বেটীর আমার মুখ ফুটেছে; আর বেদানার রসের নামে একেবারে চুপ চাপ। শুধু পানি খেলে কি হ'বে মা, আনার আঙ্গুরের রস একটু খেলে বরং বুকটা তাজা থা'কবে।"

তার পর রশীদার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা রোশনি, সব শুনলে ত'? আগে তোমার বুবুকে পানি দাও; দিয়ে ঐ টেবলের

উপর যে বেদানা আছে, ওরি মধ্যে সবচেয়ে যেটা বড় সেইটে নিয়ে রস বের কর ত' মা।"

রশীদা উঠিয়া সোরাহি হইতে ঠাণ্ডা পানি ঢালিয়া, মোমেনাকে খাইতে দিল। মোমেনা এক নিশ্বাসে পানিটুকু নিঃশেষ করিয়া, খালি গ্লাসটি রশীদার হাতে দিল, সেও সেইটা যথা স্থানে রাখিয়া, টেবল্ হইতে বেদানা লইয়া ছাড়াইতে বসিল।

এমন সময় ঝি আসিয়া বলিল "চা অনেকক্ষণ তৈরী হ'য়েছে, বেলা করে চা খেলে আপনার মাথা গরম হয় সেই জন্যে জিজ্ঞেস কর্ত্তে এলুম, চা এখানে নিয়ে আ'সব না আপনারা নীচে গিয়ে খাবেন?"

গৃহিনী বলিলেন "না গো উপরে আ'নবার দরকার নাই। আর দেখ আমিরণ, এই মেয়েকে কেবল এক কাপ্ উপরে দিয়ে যাও। মুমিকে বেদানার রসটা খাইয়ে আমরা নীচে যাচ্চি।"

একটা কাচের হাফ্ গ্লাসে করিয়া বেদানার রস বাহির করিয়া লইয়া, তাহাতে দু'ফোটা গোলাপ দিয়া রশীদা মাতার হাতে দিল। মাতা গ্লাসটা হাতে লইয়া, মোমেনার সমক্ষে উচু করিয়া ধরিয়া বলিলেন "দেখ্ দেখি মুমি, এমন সুন্দর জিনিস্ তুই খেতে চাস্না।"

মোমেনা একটু হাসিল, নার্শ ধীরে ধীরে তাহাকে শয্যার উপর বসাইয়া দিতে দিতে বলিল "আপনি খাইয়ে দিন মা, খাবেন না কেন? এত' ভাল জিনিষ, আর মায়ের হাতের সামগ্রী ভাল না হ'লেও সে অমৃত।"

গৃহিনী ঐ বেদানার নির্য্যাসটুকু কন্যাকে খাওয়াইয়া, তাহার মুখ খানি নিজের আঁচলে মুছাইয়া দিয়া, "মা তোমরা গল্প কর আমি যাই,

রোশনি চা খাবে এস" বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

চা'র খিলি পান একটা ডিবায় ভরিয়া, ভগিনীর শয্যার পার্শ্বে রাখিয়া রশীদাও মাতার অনুসরণ করিল।

মোমেনার জ্বর সাতদিন ও সাতরাত্রি নিয়ত আসা যাওয়া করিয়া, শেষে খুব ক্লান্ত হইয়া পড়ায়, অনিচ্ছায় অষ্টম দিনে ছুটী মঞ্জুর করাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। জ্বর বিচ্ছেদের দুঃখে বা সুখে বলিতে পারি না, নবম দিনে ঝোল রুটী খাইবার কথা; কিন্তু মোমেনা তাহা কিছুতেই খাইল না।

স্নেহময়ী বহুরূপী অসুখে পীড়িত ব্যক্তির মন যখন মধুর সাগুর পায়েস, বার্লির সুমধুর ঝোল, আর ঔষধের রঙ্গিণ সরবৎ খে'য়ে বিদ্রোহী হইয়া উঠে; তখন সে বেচারি হেঁচকি চচ্চড়ি, আলুনে আসেদ্ধ যাহা হয় তাই দিয়ে দুটী ভাত খাইবার জন্য নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়ে।

মোমেনা যদিও সাগুর আস্বাদন গ্রহণ করে নাই, তথাপি বার্লির ঝোল ও হরলিকস্, এবং মধ্যে মধ্যে লাল পানির ঝাঁঝাল সরবৎ তাহাকে দস্তুর মত খাইতে হইয়াছে। গরীব তাহাতেই নাকানি চোকানি খাইয়া হাঁপাইয়া পড়িয়া, দুটো ভাত খাইবার আশায় আজ শান্ত হইয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে।

সাড়ে আটটার মধ্যে নার্শ গরম পানিতে মোমেনার গা মুছাইয়া দিল। মোমেনা নিজের হাতে বোনা লেস্ টাঁকা সামিজের উপর এক-খানা ধোয়া শাড়ী পরিয়া, সময় কাটাইবার জন্য একটা বই হাতে লইয়া তাহা পড়িবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু কোন মতেই তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছে না।

এমন সময় একহাতে উপরে একখানা ডিস্ দিয়ে ঢাকা এক বাসন ভাত, তাহার উপর একটী ক্ষুদ্র নিমক্‌দানী; এবং অপর হস্তে একখানি থালায় বসান ছরপোষ ঢাকা দুই তিনটী তরকারির বাটী লইয়া, ঝি আমিরণ তথায় উপস্থিত হইল।

দুই হাত জোড়া অবস্থায় ঝিকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মোমেনা কষ্টে উঠিয়া ঝিয়ের হস্ত হইতে ভাতের বাসনটী লইলেন ও ছরপোষ ঢাকা থালাখানি টেবিলের উপর রাখিতে ইঙ্গিৎ করায়, ঝি "মাফ করুন, আমি দু'হাত জোড়া করে' এ'সেছি" বলিয়া তাড়াতাড়ি সেটী টেবিলে রাখিয়াই, প্রভু কন্যার হস্ত হইতে সত্বর ভাতের বাসনটী লইয়া ঐ স্থানে রক্ষা করিল। তৎপরে আমিরণ ঘরের মেঝের উপর একখানি মেদিনীপুরে প্রস্তুত মছলন্দ পাটী বিছাইয়া দিয়া, তাহার উপর দস্তরখান পাতিয়া, টেবিল উপরিস্থ অন্ন ব্যঞ্জনের আধারগুলি উহাতে সযত্নে রাখিল, এবং একখানি পাখা হস্তে নিকটে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

মোমেনা ধীরে ধীরে চেয়ার হইতে উঠিয়া আসিতেই, ঝি পাখা ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি বারাণ্ডা হইতে ছিলিপ্‌চি ও পানির বদনা লইয়া আসিয়া প্রভু কন্যার হাত ধোয়াইয়া দিয়া আবার সেই গুলি বাহিরে রাখিয়া আসিল। পরে পাখা উঠাইয়া লইয়া মোমেনাকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল।

ইতিমধ্যে দুইটী কাগ্‌জিলেবু ও ছুরি হস্তে রশীদা আসিয়া ভগ্নীর পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক, ঝিকে "তুমি এখন নীচেয় যাও, আমি নেবু কেটে দিয়ে বুবুকে বাতাস ক'রব এখন" বলিয়া নেবু কাটিতে আরম্ভ

করায়, আমিরণ ছিলিপ্‌চি পানি ও একখানি তোয়ালে একটু এগিয়ে রেখে দিয়ে নীচে নামিয়া গেল।

আজ নয় দিনের পর পুরাতন দাদখানি চাউলের ভাত, আর মাগুর মাছের ঝোলে লেবুর রস মেখে, মোমেনা যাহ'ক করে কিঞ্চিৎ আহার করিল। এবং হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তে ভগ্নীর হাত ধরিয়া আসিয়া চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক রশীদাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভাই রোশনি, তোমার হাতের পান বড্ড মজা, বেশী করে খিলি কত পান আমায় সেজে দাওনা বোন্। নার্শও তোমার সাজা পান খেয়ে বড়ই সুখ্যাতি করে।"

রশীদা পান সাজিতে বসিল, এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ বড় সাইজের ডিবায় একটী ডিবা পান ভরিয়া, সহোদরার হস্তে দিয়া, একখানি চেয়ার টানিয়া তাহাতে উপবেশন করিল।

আমিরণ আসিয়া ভুক্তাবশিষ্টগুলি গুছাইয়া রাখিয়া, মছলন্দটী গুটাইয়া তুলিয়া, সেগুলি লইয়া নীচের নামিয়া গেল; এবং যাইবার কালে ভগিনিদ্বয়ের আর কোন ফরমায়েস আছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া গেল।

ঝি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই "ভাত খেয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়োনা মা" বলিতে বলিতে, মোমেনার মাতা ঘরে ঢুকিলেন।

রশীদা বলিল "সেই জন্যই আমি বসে' আছি মা" অসুখের পর ভাত খেলে প্রথম প্রথম বড্ড ঘুম পায়। নার্শ না আসা পর্য্যন্ত আমি এখানে থা'কব।

গৃহিণী বলিলেন "নার্শের নাওয়া হ'লেই সে উপরে আ'সবে;

তোমরা দুই ব'সে ততক্ষণ কথাবার্ত্তা ব'ল।"

মোমেনা উত্তর করিল "না মা, তার চেয়ে বরং রোশনি একটা বই পড়ুক, কথা বল্‌তে গেলে আমি হয় ত' ঘুমিয়ে প'ড়ব। এরই মধ্যে চোখ দুটো যেন আমার টেনে ধ'র্‌ছে। গল্পের চেয়ে বই ভাল লা'গবে ও ঘুম আর আ'সবে না।"

খুসী হইয়া মাতা বলিলেন "বেশ তবে তাই ভাল" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তখন রশীদা "কোন বই প'ড়ব, কোনটা তোমার শুন্‌তে ভাল লা'গবে বল ?" জিজ্ঞাসা করায়, মোমেনা "সেল্‌ফের উপর থেকে আনওয়ারা আনিয়া পড়" বলিলেন। সেই মত ছোট ভগ্নীও পড়িতে আরম্ভ করিল।

যে স্থানে আনওয়ারা স্বামীর প্রাণ রক্ষার্থে নিজের প্রাণের মমতা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, কি না দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, সেই স্থানটী শুনিতে শুনিতে, মোমেনার চক্ষু দুইটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এমন সময় সিড়ি হইতে "ক্ষমা করুন বড় কষ্ট দিয়েছি" বলিতে বলিতে নার্শ উঠিয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া, মোমেনা চকিতে অঞ্চল প্রান্তে চক্ষু মর্দ্দন করিয়া, যথা সম্ভব কৃত্রিম হাসিমুখে দুয়ারের দিকে চাহিল। ধাত্রীও ঠিক সেই সময়ে এলো চুলে কক্ষে প্রবেশ করিল।

মোমেনা বলিল "তবুও ভাল" এতক্ষণ পরে আপনার আমাদের কথা মনে পড়েছে। সেই ন'টা থেকে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত নাওয়া, কাজেই আমার ভয় হচ্ছিল, বুঝিবা নাইবার ঘাটে আমাদি'কে হারিয়েই ফে'ললেন। যাক্ বাঁচা গেল আপনার স্মরণশক্তির তারিফ ক'রতে হয়; কারণ দু'ঘণ্টা পানির সঙ্গে মহব্বৎ করেও আমাকে ভুল্‌তে পারেননি।"

ধাত্রী একগাল হাসিয়া বলিল, "ইষ্! ভারি যে ঠাট্টা করা হ'চ্চে যিনি ভাত না খেয়ে বই পড়ে শুনাচ্ছেন, তাঁর কাছে বরং আমি দোষী। কিন্তু তিনি আছেন লক্ষ্মী মেয়েটির মত চুপ করে; আর আপনি খেয়ে দেয়ে পেট্‌টি বেশ ঠাণ্ডা ক'রে আমার প্রতি এখন বিদ্রুপবাণ নিক্ষেপ ক'রতে ব'সলেন।

আমি বুঝি দু'ঘন্টা ধরে কেবলই নাইছিলুম!" তার পর আঙ্গুল গ'ণে গ'ণে, "এই গল্প, সল্প, নাওয়া, খাওয়া, আশা, যাওয়া এই ছ'টি কাজ আমি দু'ঘন্টার মধ্যে শেষ করেছি ও আপনাদের কাছে এসেছি। কোথায় বীর টীর গোছের একটা বড় উপাধি দেবেন, না উল্টে ঠাট্টা!"

তার পর রশীদার দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনি যান্ ভাই, মা আপনার জন্য বসে' আছেন। মায়ের জেদে আজ আপনার আগেই আমাকে ভাত খেতে হ'ল।"

"তা'তে আর কি হ'য়েছে" বলিয়া হাসিতে হাসিতে রশীদা চলিয়া গেল। নার্শ মোমেনার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল "আপনার ডিবার এক আধ খিলি পান খে'তে পা'ব, না আজ আমার সঙ্গে আড়ি?"

মোমেনা উত্তর করিল 'আড়ি ত'—রোজই হয়, আবার ভাব হ'তেও দেরি লাগেনা। আজ কিন্তু একটা গান বাজিয়ে না শুনা'লে শিগ্‌গীর ভাব হ'বে বলে মনে হচ্চে না।"

মৃদু হাসিয়া নার্শ বলিল 'তা'ও ত' বটে, গান গেয়ে প্রায়শ্চিত্ত না ক'রলে ভাব হওয়াও ত' অসম্ভব। আচ্ছা দেন একটা পান খেয়ে গান ধরি।"

মোমেনার ভ্রাতা আনিছর রহমান, আলিগড় হইতে আসার পর

ডোয়ার্কিনের দোকান হইতে একটী পাঁচ অক্টেভ, অর্গান টিউনের উৎকৃষ্ট টেবল্ হারমোনিয়াম কিনিয়া ছিলেন। ঐ বাদ্য যন্ত্রটি মোমেনার ঘরের একপার্শ্বেই ছিল। উহার নিকট গিয়া নাশ তাহার ঢাকনা খুলিয়া ফেলিল এবং তাহার সম্মুখস্থ সবুজ মখমল মোড়া ছোট ষ্টুলটিতে বসিয়া দুই তিনটী ষ্টপার একত্রে টানিয়া পদাঙ্গুলি সাহায্যে বেলো করিতে করিতে, হারমোনিয়ামে সুর দিতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে—

"(দেখ) হৃদয় আসন রেখেছি শূন্য
তব মুখখানি ভাবিয়ে।
দিবস রজনী ছিলাম বসিয়া
তব আশা পথ চাহিয়ে॥
(ওগো) তব আশা পথ চাহিয়ে।
পলে পলে কত গুণেছি দিন
(আমি) মোহন মূরতি আঁকিয়ে।"

ইত্যাদি, গানটি গাহিতে আরম্ভ করিল।

গান শেষ হইতে না হইতে "বাঃ বাঃ ঘর জমকে উঠেছে যে" বলিয়া রণীদা ঘরের মধ্যে, প্রবেশ করিল। এবং গান থামিলে বলিল "আমি আপনার গান শুনচি না, আমাকে ছেড়ে নিজেরা একা একা গান আরম্ভ করে দিয়েছেন।"

ধাত্রী বলিল "ছেড়ে কই, আপনাকে ডাকছিতো।"

"কখন ডাকলেন?"

"এই যে মুখে না ডেকে যন্ত্রে ডাকছি, টেলিফোনে ডাকাটা কি আর ডাকা নয়? আমি জানি গান শুনলে আপনি আ'সবেনই।"

"তবে ডি, এল, রায়ের একটা স্বদেশী গান বাজান।"

নার্শ আবার হারমোনিয়ামের সুর বদলাইয়া আরম্ভ করিল—

"ধন ধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।"
ইত্যাদি।

যে কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে বসিয়া সুর জমিয়া উঠিলে, আর তাহা শীঘ্র ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। স্বদেশী গানটি পাল্টাপাল্টি তিনবার গাহিয়া ও তৎসঙ্গে বাজাইয়া শেষ করিয়া, নার্শ পুনরায় সুলেখক রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের প্রাণ স্পর্শী গান—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভাল বাসি"

আলাপ করিতে করিতে, ক্রমশঃ হারমোনিয়ামের সুরে সুর মিশাইয়া মধুর কণ্ঠে—

"তুমি অবসর মত বাসিও।
আমি নিশিদিন হেথা বসে' আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিও॥"

গাহিতে লাগিল।

মোমেনার কাণের ভিতর দিয়া বাজিয়া উঠিল—

"তোমার যখন মনে পড়ে আসিও।"

আহা কি সুন্দর কথা! "তুমি অবসর মত বাসিও" তাই এসো গো, আর তাই বে'সো; আমি প্রার্থনা করি "তোমার যখন মনে পড়ে" তখনই তুমি এসো।

"আমি সারানিশি তব লাগিয়ে,
রব বিরহ শয়নে জাগিয়ে॥

তুমি নিমিষের তরে প্রভাতে এসে,
মুখ পানে চেয়ে হাসিও ॥" ইত্যাদি

এটা শেষ করে নাশ রবীন্দ্র ঠাকুরের আর একটা গান ধরিল—

"মেঘের উপর মেঘ করেছে আঁধার ক'রে আ—সে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে ॥
কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নানা লোকের মাঝে;
আজ আমি যে বসে আছি তোমারি আশ্বা—সে ॥
তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা
কেমন করে থা'কব বলো, এমন বাদল বেলা ॥
দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি।
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে ॥"

গানটি দুই তিনবার গাহিয়া নাশ উঠিয়া পড়িল। গান বন্ধ হইল, বাজনা থামিয়া গেল; কিন্তু সুরটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মোমেনার কাণের মধ্য দিয়া, বুকের ভিতর গিয়া ধাক্কা মারিয়া বলিতে লাগিল "পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।"

অগো! আমার প্রাণ যে বিশ্বময় কেঁদে বেড়াচ্চে। আর আমি কেবল মাত্র বেঁচে "আছি তোমারি আশ্বাসে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

——:০:——

আজ কয়েক দিন হইতে দুঃখীর মায়ের শরীর ভাল না থাকায় একজন নূতন রাধুঁনি রান্না করিতেছে। আনওয়ার আলির অনুরোধে তাহার সহোদরা হাসিনা এখনও এখানে আছেন। তাহার স্বামীও ইহাতে মত দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন বড় ভাই সাহেবের মনোকষ্ট দিয়া তুমি যাইবার জন্য জেদ করোনা। তোমাদিগকে বিশেষতঃ খোকাকে দেখিলে, তাঁহার মন যদি ভাল থাকে, তাহা হইলে বরং তোমার এখন গিয়ে কাজ নেই, দিন কত থেকে যে'ও।

হাসিনা একদিন সকালে চা পান করিতে বসিয়া, ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ ঝি তরকারিতে একটু বুঝে সুজে নুণ দিও, রাত্রের মাছের কালিয়ায় বেশী নুণ হওয়ায়, অমন মাছটা একদম বেমজা হ'য়ে গিয়েছিল।

• বিস্ময় সহকারে ঝি বলিল—

"ওমা ওর নাম কি নুণ বেশী হ'য়ে ছিল! ওগো বুবুজী ওর নাম কি মুই, ওর নাম কি এতটুকু নুণ দিয়েছিনু, তা আপনারা ওর নাম কি বোধ হয়, ওর নাম কি কুম নুণ খাও।"

হাসিনা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "ঝিয়ের এক নূতন কথা, সে দিন পটল চিংড়ীর রান্নায় খুব কম নুণ হয়েছিল, সে কথা বলায় তুমি বল্লে "অত নুণ দিনু তবুও নুণ হয় নি', তোমরা বেশী নুণ খান।" আবার আজ সেই পাঁচ সাতবার ওর নাম কি ওর নাম কি করে, বল্লে কি না কম নুণ খান; তা আমরা কি একদিন কম নুণ আর একদিন বেশী নুণ খাই। তা থাক্, তুমি বরং কম নুণই দিও সে ভাল, কিন্তু বেশী দিয়ে কাজ নাই।"

ঝি কেবল মাত্র "মোরা গরীব নোক, ওর নাম কি মোদের নানা দোষ; মোরা ওর নাম কি বড় নোক হ'লি কেউ এককথাও ওর নাম কি বল্তি পাত্তনি।" বলিয়া আপন মনে গজ্‌গজ্‌ কর্ত্তে কর্ত্তে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল, ও সেখানে গিয়া গালি দিল কি আশীর্ব্বাদ করিল কিছুই বোঝা গেল না।

হাসিনা চা পান শেষ করিয়া উপরে উঠিতেছেন এমন সময়, আদুড় গায়ে বিড়াল ছানা কোলে করিয়া খোকা আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতা পুত্রের দিকে সস্নেহে চাহিয়া বলিলেন "কি গো বাবু ঘুম ভাঙ্গলো? আবার ঘুম থেকে উঠেই, পুসিকে কোলে নেওয়া হ'য়েছে দে'খচি। খোকা নিজের পুসিকেই ভালবাসে, ওকেই কোলে নেয়, আমাকে একটুও ভালবাসে না কোলেও নেয় না।" বলিয়া ভ্রাতার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

খোকাও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে ব্যস্ত হইয়া বলিল "বাচি মা বাচি, আপনিকেও ভাল বাচি।"

মাতা বলিলেন, "বাস বাপ, আমাকে ভালবাস। তবে তোমার

পুসিকে বেশী আর আমাকে কম ; কেমন ?"

খোকা—"না আম্মাদান, চন্দনকেই ছোমান।"

কৃত্রিম ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে মাতা বলিলেন, "তা'হলে কই আমাকেত' কোলে লওনা ; আমার বুঝি ল্যাজ নেই তাই ?"

পুত্র কচিমুখে মুক্তার ন্যায় দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া মায়ের কাছে দৌড়িয়া গেল, ও কোলে থাকা বেরাল সমেত মাতার গলা জড়াইয়া বলিল—

"এই যে আপনিকে কোলে নিয়েছি।"

মাতা হাসিয়া পুত্রের মুখে অনেকগুলি চুম্বন করিলেন ও পুত্রকে কোলে লইয়া হাসিতে হাসিতে নীচেয় নামিয়া গেলেন !

নবম পরিচ্ছেদ।

——:o:——

কার্ত্তিক মাসের দিবা অবসান প্রায়। সন্ধ্যার পরই একটু একটু শীত বোধ হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে, কিন্তু আজ সমস্ত দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও বাতাসের নাম গন্ধ না থাকায়, যেন ভাদ্র মাসের ন্যায় গরম বোধ হইতেছে।

এই সময় আনওয়ার আলি নদীর ধারে সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য একটী পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া ও হাতে একটী সরুগোছের ছড়ি লইয়া, যেমন সদরের বাহির হইলেন; ঠিক সেই সময়ে ডাকপিয়ন চামড়ার ব্যাগ স্কন্ধে ঝুলিয়ে, বামহাতে একগোছা পত্রের মধ্যে বাছিতে বাছিতে, সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিয়াই একখানি পত্র উকিল সাহেবের হস্তে দিল।

উপরে মুর্শিদাবাদের মোহর দেখিয়া তাড়াতাড়ি খাম খানি ছিঁড়িয়া তন্মধ্য হইতে একখানি ঈষৎ নীল রংয়ের লেখা কাগজ বাহির করিলেন। পত্রের শেষাংশে "বিনীত আনিছর রহমান" নাম লেখা দেখিয়া আরও ঔৎসুক্যের সহিত পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল—

ছোট উকিল সাহেব —

আদাব জানিবেন।

এযাবৎ বহু অনুসন্ধানেও ডাক্তার সাহেবের কোনই কুল কিনারা পাইলাম না।

নিরুদ্দেশ হইবার সমসাময়িক তাঁহার লিখিত, তাঁহার পিতার নামীয় পত্রে, শান্তাহারের পোষ্ট মার্ক দেখিয়া অনুমান হইতেছে যে, তিনি দার্জ্জিলিং বা শিলং যাইবার পথে ট্রেণ হইতে শান্তাহার জংসনে সেই পত্রখানি ডাকে দিয়াছিলেন।

আমার ইচ্ছা যে, জনৈক আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া সামনের সপ্তাহে তাঁহাকে ঐ অঞ্চলে খুজিতে বাহির হইব।

আশা করি আপনারা শারীরিক কুশলে আছেন। ইতি

বিনীত

আনিছর রহমান।

পত্রপাঠে আনওয়ার আলির বন্ধুর নিরুদ্দেশ জনিত হা হুতাশের ছাই চাপা বহ্নি, যেন স্বর্ণকারের জাঁতার ফুৎকার পাইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকার পর আনওয়ার চঞ্চল ভাবে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

ক্রমে মেঘের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল। আনওয়ার জানালার বাহিরের গাছগুলির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায় নিষ্ঠুর অদৃষ্ট তোমার আবার এ কি পরিহাস! আমি ত' কখনও ভাবি নাই, কখনও কল্পনাও করি নাই যে, আমারই

সুখের আশায়, আমারই সন্তুষ্টি উৎপাদন মানসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়বন্ধু অকৃতকার্য্যতার লজ্জা নিবারণার্থে দেশ-ত্যাগী হইবেন।

হায় বন্ধু! তুমি কি তোমার আনওয়ারকে একটুও চিনিলে না? আমার ঈপ্সিত বিবাহ প্রস্তাবে বাধা পাওয়া দূরের কথা, তুমি যদি স্বয়ং আমাকে বলিতে "আনওয়ার, তোমার সঙ্গে আমার শ্যালীর বিবাহ আমরা দিতে পারিব না বা দিব না" তাহা হইলেও আমি প্রাণ খুলিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিতাম। মনে ভাবিতাম, আমারই উপকারের জন্য এ বিবাহে আমার প্রিয় বন্ধুর মত নাই।

তুমি তাহা না করিয়া আমাকে চির ঋণজালে জড়াইয়া, লজ্জার অতলস্পর্শী বারিধি গর্ভে নিঃক্ষেপ করিলে! এবং নিজের সুখ শান্তিতে পদাঘাত করিয়া কোন্ বন্ধুহীন রাজ্যে চলিয়া গেলে?

আচ্ছা যাও, তোমার যেথা ইচ্ছা যাও। দেখিতে পাইবে আনওয়ার চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া একদিন না একদিন তোমার সহিত মিলিত হইবে।

আনওয়ার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জাফর সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া অজুর নিমিত্ত একখানি অনুচ্চ টুল, এক বদনা পানি ও তোয়ালে ঘরে' বারান্দায় ঠিক করিয়া রাখিয়া গেল।

উকিল সাহেব অজু করিয়া মগরেবের নমাজ পড়িবে...

একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া, রাস্তার ধারের জা...

বাহিরের অন্ধকারের সহিত নিজের ভি...

লাগিলেন।

স্বপ্নদৃষ্টা

দেখিলেন তাহার প্রাণের ভিতরকার অন্ধকার বাহিরের চেয়ে অনেক বেশী। সে অন্ধকারের শেষ নাই, সীমা নাই, তুলনা নাই। তাহার এই সংক্রামক তিমিরের সংস্পর্শে তাহার কান্তিময় শান্তিময় বন্ধুও তিমিরাচ্ছন্ন হইয়াছেন ও কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন।

আজ যে ঐ চন্দ্র তারকা খচিত নীল আকাশখানিকে মেঘের অন্ধকারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, উহা কতক্ষণের জন্য! হয় ত' অল্পক্ষণ পরেই মেঘ সরিয়া যাইবে ও উহার পূর্ব্ব শোভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া হাসিতে থাকিবে। চাঁদ উঠিবে, তারা ফুটিবে। যেমনটি ছিল আবার ঠিক তেমনিটী হইবে।

কিন্তু আমার বুকের নীচের ছোট আকাশ খানির, ক্ষুদ্র চন্দ্র টুকুর যে চির সমাধি হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উদ্ধার হইবে না। কিম্বা তাহার শূন্যস্থান আর হয় ত' কোন নব চন্দ্রের অধিকারে আসিবে না।

থাক্ তাহা না হয় নাই হউক, তাহার জন্য বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া আর একজন কেন সেই অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে গেল!

কেন অগো কেন?

দশম পরিচ্ছেদ।

—— :o: ——

এই কেনর উত্তর কেহই দিল না। আমরা অবশ্য এইটুকু দিতে পারি যে, প্রকৃত বন্ধু যে তাহার গভীর বন্ধুত্বের পরিচয় এই হইতেছে, বন্ধুর দুঃখের ও সুখের সমান ভাগ লওয়া।

আর যে খাঁটি মানুষ, তাহার পরিচয় মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিয়া অমানুষকে লজ্জা দেওয়া। বিদ্বানের কাজ, মূর্খকে শিক্ষা দেওয়া। দয়ালুর কাজ, দুর্ব্বলের প্রতি দয়া প্রকাশ দ্বারা হৃদয়হীন যে তাহাকে অপমানিত করা।

আনওয়ার তোমার এই কেনর উত্তর, ইহা অপেক্ষা আর অধিক দিবার ক্ষমতা আমার অপরিপক্ক বুদ্ধিতে যোগাইতেছে না। আমার উত্তর গুলি তোমার পছন্দ হইবে কি না জানি না, তবে আমার যাহা বিবেচনায় আসিল বলিলাম।

আহারের জন্য ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে, আনওয়ার আলি তাহাকে "শরীর ভাল নাই রাত্রে কিছু খা'ব না" বলিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। বেচারা চাকর, মনিবের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা বা অধিকার তাহার নাই; কাজেই যে পথ দিয়া আসিয়াছিল,

সে সেই গল্প পাল্টা ধরিল।

কিছুক্ষণ পরে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে হাসিনা খাতুন এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুঃখীর মা আসিয়া, আনওয়ার আলিকে এ ঘর সে ঘর খুঁজিয়া না পাইয়া হাসিনা মৃদুস্বরে ভাই, বড় ভাই বলিয়া ডাকিতেই, "এই যে আমি এখানে বসিয়া আছি" বলিয়া আনওয়ার আলি উঠিয়া আসিলেন।

শরীর ভাল নাই বলছ কেন ভাই? কি হ'য়েছে তোমার? বলিতে বলিতে হাসিনা নিকটে আসিয়া ভ্রাতার কপালে হস্ত স্পর্শ করিয়া "তাইত' কপাল বেশ গরম দেখ্‌ছি, কখন অসুখ ক'রল?" বলিবা মাত্র "খোদা না করে ওকথা ব'লতে নাই মা" বলিয়া দুঃখীর মা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আনওয়ার আলির পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল "কখন থেকে এমন হ'ল বাবা?"

আনওয়ার আলি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "কই গো আমার কি হ'য়েছে, কিছুই ত' হয় নি', শুধু শুধু তোমরা ভেবে সারা হ'চ্চ।"

"তা'ই হ'ক বাবা, খোদা করে কিছু নাই হ'ক। তোমার যত আলাই বালাই সব আমাকে আসুক" বলিয়া দুঃখীর মা নিজের হাত আনওয়ার আলির গাত্রে বুলাইয়া, সেই হাত ফিরাইয়া আনিয়া নিজের বুকে স্পর্শ করাইতে লাগিল।

তখন হাসিনা বলিলেন "আচ্ছা বড় ভাই, আপনার ত' কিছু হয় নাই ব'লছেন, তবে রাত্রে খাবেন না কেন?" বলিয়া দুঃখীর মায়ের দিকে ফি'রে বলিল "চ'ল গো খালা বড় ভাইকে ভাত দেবে চ'ল।"

আনওয়ার আলি তাহাতে উত্তর করিল "সত্যি আমার মোটেই

ক্ষিদে নেই, আর মাথাটাও একটু ভার ভার বোধ হচ্চে, সেই জন্য রাত্রে কিছু খে'তে ইচ্ছে নেই।"

তার পর দুঃখীর মা ও হাসিনার যৌথ উপদেশ আরম্ভ হইল। একি না রাত্রে উপবাস দিতে নেই, রাত্রে অনাহারে থাকিলে শরীর দুর্ব্বল হ'য়ে যায়; যদি একান্ত পক্ষে ভাত না খাইবার ইচ্ছা হয় অন্য কিছু খাওয়ারও দরকার ইত্যাদি।

হার মানিয়া শেষে আনওয়ার আলিকে বাধ্য হইয়া একটু দুগ্ধ পান দ্বারা রাত্রের উপবাস রক্ষা করিতে হইল।

রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় আনওয়ার আলি শয্যা গ্রহণ করিলেন। অল্পক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর নিদ্রা অনুভূত হওয়ায়, শান্তিদায়িনী নিদ্রা দেবীর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়া অল্প সময়ের জন্য সমস্ত দুঃখ বেদনা বিস্মৃত হইলেন।

হঠাৎ কিসের একটা ভয়ানক শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করায়, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ধড়মড়িয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া, বাহিরের প্রলয়কাণ্ড অনুভব করিতে লাগিলেন।

বাস্তবিক বাহিরে সেই সময় এক তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল। ঝড়, মেঘ ও বৃষ্টি, তিনজনে মিলিয়া প্রলয় যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়াছে।

খাট হইতে নামিয়া, আনওয়ার আলি হারিকেনের আলোটা উচু করিয়া দেখিলেন, ঘড়িতে একটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট হইয়াছে, ভাঙ্গা-ঘুম শিগ্‌গীর জোড়া লা'গবে না মনে করিয়া আনওয়ার টেবল হইতে খবরের কাগজ খানা টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিলেন। দুই চারি লাইন পড়িয়া কাগজ খানি ঠেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বাহিরে বিপন্ন বাতাস হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই পাগল রাত্রের আকুল ক্রন্দন আনওয়ার আলির ক্ষত প্রাণে একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা মারিল। তিনি ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্বোক্ত জানালার নিকট আসিয়া, জানালার গর'দের উপর মস্তকের সম্মুখভাগ স্থাপন পূর্ব্বক বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া র'হলেন।

উঃ! প্রকৃতির কি ভীষণ উত্তেজনা, আর সেই নিষ্ঠুর উত্তেজনা ও উপদ্রব, মাথা পাতিয়া নীরবে সহ্য করিতে হইতেছে বেচারা বৃক্ষগুলিকে।

বিদ্যুতের চোখ রাঙ্গানি, মেঘের ভয়ঙ্কর তাড়না উপেক্ষা করিয়া, উন্মত্ত বাতাস না না, খাঁ খাঁ, সাঁ সাঁ রবে চীৎকার করিতে করিতে নিরীহ গাছগুলির উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া, তাহাদের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে ভূমিসাৎ করিয়া দিতেছে।

অসহায় গাছগুলির দুঃখে দুঃখিত হইয়া আবার মেঘগুলি আর্দ্র-স্বরে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

আনওয়ার আলি অপলক নেত্রে এই করুণ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে হইল না, বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ আলোক তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া দিতে লাগিল। মেঘের হুঙ্কারে তাঁহার কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল। পানির ঝাপ্টা আসিয়া অঙ্গের বসন সিক্ত করিয়া দিল।

হু হু করিয়া ঘরের মধ্যে বাতাস প্রবেশ পূর্ব্বক টেবলস্থ কাগজ পত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। আনওয়ার তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। এবং লণ্ঠনের আলো কম করিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সামান্যক্ষণ ঘুমাইবার পর, আনওয়ার আলি তন্দ্রাঘোরে শুনিতে পাইলেন, তাঁহার শয়ন কক্ষের দ্বারে কে যেন ধাক্কা মারিতেছে। তন্দ্রাবস্থায় উৎকর্ণ হইয়া ভাল করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলেন। পুনরায় সেই মৃদু করাঘাত ও সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ডাকিল "আনওয়ার।"

ডাক্তার ভাই যে! আনওয়ার আলি শায়িত অবস্থা হইতে স্প্রীংয়ের মত ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তড়াক্ করিয়া পর্য্যঙ্ক হইতে লাফাইয়া "যাই ভাই, যাচ্চি" বলিতে বলিতে বিদ্যুৎবেগে দ্বার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, পরিধানের শিথিল বস্ত্র বামহস্তে ধরিয়া অপর হস্তে একটানে দরজার ছিটকানি খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

আনওয়ার দেখিলেন কোথায়ও কেহ নাই। সেকি! এই যে আমি স্পষ্ট তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম! এই মাত্র যে তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন! তবে কি এ' অন্য কাহারও দুরভিসন্ধি।

আনওয়ারের মনে ভয়ের উদ্রেক হইল। সভয়ে তিনি দুই হাত পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তে সামলাইয়া লইয়া, ঈষৎ

কম্পিত কণ্ঠে "কে, কে ডাকে——?" কিন্তু কে আছে যে উত্তর দিবে। কেবল মাত্র একটা ফাজিল বাতাস বারাণ্ডার এক প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া বিদ্রুপ ছলে তাহার গালে একটা ক্ষুদ্র চপেটাঘাত করিয়া, মুখের সম্মুখ দিয়া না, না, না বলিতে বলিতে অন্য প্রান্ত দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

ভ্রান্ত যুবক, তুমি কি জাননা বিকৃত মস্তকে নানা কল্পনার উদ্রেক হয়। বিশেষতঃ যে বিষয় লইয়া অধিকক্ষণ মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করা যায়, সেই চিন্তা ধ্যানে, জ্ঞানে, শয়নে স্বপনে মানবের মনে উদয় হইয়া তাহার সহজ মস্তক ক্রমশঃ বিকৃত করিয়া তুলে। আবার ইহার আধিক্যেই উন্মাদ রোগের উৎপত্তি।

সুখ, দুঃখ, আশা ও নিরাশা, এই চারিটিতেই ভয়ানক মাদকতা শক্তি আছে। আলোচনা দ্বারা ইহা যত অধিক পরিমাণে পান করিবে, ইহার মাদকতা ততই অধিক প্রকাশ পাইবে।

আনওয়ার, তুমি এত স্থির, ধীর, গম্ভীর ও সংযমী পুরুষ হইয়াও প্রিয় বন্ধুর বিচ্ছেদ জনিত কষ্টের ঐকান্তিক আলোচনা করিতে করিতে রক্তময় হইয়া গিয়া এই মহাভুলে পতিত হইয়াছ। বাহিরের বাতাসের ধাক্কা দ্বারে মানবের করাঘাত ভাবিয়া, বায়ুর গর্জ্জন প্রাণের বন্ধু আহম্মদ হোসনের কণ্ঠস্বর বুঝিয়া পাগলের ন্যায় দ্বার খুলিয়া তাহার অভ্যর্থনার আশায় বাহিরে আসিয়া পড়িলে, এবং কাহাকেও তথায় না দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছ।

তোমার মত অবস্থায় পড়িয়াই বোধ হয় গায়ক গাহিয়াছিল—

"দিবস রজনী, আমি যেন কার আশার আশায় থাকি।
তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ তৃষিত ব্যাকুল আঁখি॥

চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই, সদা মনে হয় যদি তারে পাই।
কে আসিল বলে চমকিয়া চাই, কাননে ডাকিলে পাখী ॥"

ইত্যাদি।

ঝড় বৃষ্টি সমানই চলিতেছে, আনওয়ার আলি বারাণ্ডার খুঁটি ধরিয়া অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া, অবশেষে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাকী রাত্রি টুকু তাহার চিন্তান্বিত অনিদ্রায় অতিবাহিত হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণ দুই মাস গত হইতে চলিল, আজ পর্য্যন্ত আহম্মদ হোসেনের কোনই সংবাদ পাওয়া গেলনা। মন ত' আর স্থির রাখিতে পারিতেছি না। দেশ বিদেশে পত্র লিখিয়া, সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিয়া, এত চেষ্টা করা গেল সমুদয় ব্যর্থ হইল। এদিকে ডাক্তারের সম্বন্ধীরাও বোধ হয়, অতটুকু সামান্য সূত্র অবলম্বনে তাঁহাকে খুজিয়া বাহির করিবার আশায়, দার্জ্জিলিং ও শিলং অঞ্চলে গিয়া পড়িয়াছে। আমিও এক বার ভাগ্য করিয়া চেষ্টা করিয়া দেখি। খোদার মর্জ্জিতে কি নিহিত আছে কাহারও জানিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু আমি আর এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেছি না। এত দিন তাঁহার আশায় পথ চাহিয়া রহিয়াছি। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ডাক্তার কখনই তাহার প্রেমময়ী পত্নীকে ছাড়িয়া বেশীদিন কোনস্থানেই থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু এখন বুঝিতেছি সেটা আমার মস্ত ভুল। কর্ত্তব্যপরায়ণ সবলচিত্ত ব্যক্তিকে দুর্ব্বল স্নেহবন্ধনে বাঁধা যায় না।

আনওয়ার আলি এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া, অবশেষে স্থির করিলেন যে, বড়দিনের বন্ধের আর ২০।২৫ দিন দেরি আছে, তা' থাক্

আমি হাতের চলতি মকর্দ্দমা গুলি, দিন দুইয়ের মধ্যে অপর একজন ভাল উকিলকে বুঝাইয়া দিয়া একবার ডাক্তার সাহেবের খোঁজে পশ্চিমাঞ্চলে যাই।

পর দিবস কোর্টের কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বেই, বেলা দুইটার মধ্যে আনওয়ার আলি বাড়ী আসিলেন; এবং অফিসের জামা কাপড় না ছাড়িয়াই, বিশ্রাম কক্ষে আরাম কেদারায় বসিয়া, প্রথমতঃ কোথায় যাইবেন এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই দুই মাসের মধ্যে উকিল সাহেবের চেহারার এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে হঠাৎ তাঁহাকে দেখিলে চেনা যায় না। পূর্ণ দুই মাস রোগশয্যায় পড়িয়া ভীষণ রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিলে, মানবের যেরূপ অবস্থা হয়, আনওয়ার আলির অবস্থাও প্রায় সেই মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

হাসিনার এখানে অবস্থানকালে, তাহার প্রাণঢালা সেবা যত্নে এবং ভাগিনেয়ের বালক সুলভ ক্রীড়া কৌতুক দর্শনে, এই মাস দেড়েক আনওয়ার আলির বেশ একরকম ভাল অবস্থায় কাটিয়াছিল। এখন তাহারা চলিয়া যাওয়ায়, আনওয়ার আলির অশান্তি প্রবল বেগে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিনগুলি তাহাদের বিদায়ের পর হইতে ক্রমশঃ দীর্ঘ অনুমিত হইতে আরম্ভ হইল। বাড়ীর খাঁ খাঁ শূন্যতার সঙ্গে তাঁহার প্রাণের শূন্যতাও বাড়িতে বাড়িতে ক্রমশঃ অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া বসিল ও প্রত্যহ হাত পা ছড়াইতে লাগিল।

পূর্ব্বোক্ত ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছাদের দিকে চাহিয়া আনওয়ার আলি পূর্ব্বপশ্চাৎ কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবনার বিরাম নাই।

যেমন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া ভাসমান খড় কুটাগুলিকে ওলটপালট করিয়া দেয়; তদ্রূপ চিন্তার উপর চিন্তার তরঙ্গে তাহার আহত হৃদয়খানিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিতে লাগিল। চিন্তার দারুণ উত্তেজনায় এই অগ্রহায়ণ মাসের শীতেও আনওয়ার আলির জামা কাপড় ঘর্ম্মে ভিজিয়া উঠিল। ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিতে আরম্ভ হইল।

কপালের ঘাম মুছিতে গিয়া, তাঁহার স্বর্গীয়া স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া গেল। হায়! সে দিন কোথায় গেল! যথেষ্ট দাস দাসী সেবার জন্য নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও যিনি নিজের হাতে স্বামীকে বাতাস করিয়া, তাঁহার জামা জুতা খুলিয়া দিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেন। নিজের মূল্যবান কাপড়ের আঁচলখানিতে স্বামীর ললাটের ঘাম মুছিয়া দিয়া, একটা গৌরবময় তৃপ্তি অনুভব করিতেন; তিনি আজ কোথায়!

বহু দিবস পরে আনওয়ার আলির শুষ্ক সংযত চক্ষু হইতে, শ্রাবণের ধারার ন্যায় অশ্রু বহিয়া তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল। তিনি মুখে রুমাল চাপা দিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন।

কাঁদ আনওয়ার, তুমি প্রাণ ভরিয়া কাঁদ। তোমার বুকের বেদনা গলিয়া অশ্রু রূপে তোমার নয়ন পথ দিয়া বাহির হউক; অন্যথায় দুঃখের চাপ তোমার ক্ষুদ্র বুকখানি সহ্য করিতে না পারিয়া ফাটিয়া খান্ খান্ হইবে।

অসহ্য গ্রীষ্মের পর বারি পাতে ধরণী বক্ষ যেমন শীতল হয়; মানবের ক্রোধানল খুব খানিকটা বাক্য বর্ষণে যেমন নিভিয়া যায়;

ঘন ঘেরা মেঘ যেমন বায়ু তাড়নে সরিয়া, ভাঙ্গিয়াচুরিয়া শেষে এক-কালীন বিলীন হইয়া যায় ; আনওয়ার আলির বুকভরা দুঃখ, প্রাণ ভরা অশান্তি তেমনি অশ্রু বর্ষণে অনেক হাল্কা হইয়া গেল।

ক্রন্দনের কৃপায় আনওয়ারের মনের গুরুভাঁর লাঘব হইলে, তিনি উঠিয়া কোর্টের ব্যবহার উপযোগী জামা কাপড় ছাড়িলেন। পরে অজু করিয়া জোহরের নমাজ পড়িলেন। নমাজ শেষ হইলে, নমাজের পাটি তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত চেয়ারে পুনরায় উপবেশন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের উপর কপোল ন্যস্ত করিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন।

হঠাৎ আনওয়ার আলির চমক ভাঙ্গিল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া, নিকটবর্ত্তী ড্রয়ার হইতে লেটার পেপারের একটি প্যাকেট বাহির করিলেন, এবং আবরণ উন্মুক্ত করিয়া তন্মধ্য হইতে একখানি কাগজ লইয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

দুই চারি লাইন লেখা হইল ; আবার কি মনে করিয়া সেটা ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া, পদপ্রান্তে স্থাপিত বেত্র নির্ম্মিত নষ্ট কাগজাধারে ফেলিয়া দিলেন।

পুনরায় আর একখানা পত্র লিখিবার কাগজ লইয়া তাহাতে লিখিলেন।—

ভাই,

আদাব জানিবেন।

নানা কারণে আমার মন ভাল না থাকায়, কোর্ট বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই আমি একবার ভ্রমণে বাহির হইতেছি।

কোথায় যাইব তাহা এখনও ঠিক করি নাই। সম্ভবত পশ্চি-

মাঞ্চালেই যাইব। বিদেশে গিয়া যখন যেখানে থাকিব তাহা আপনাকে জানাইব।

আমার একটি অনুরোধ, যে ডাক্তার সাহেবের কোন সংবাদ পাইলেই, তৎক্ষণাৎ আমার ঠিকানায় টেলিগ্রাম করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন, আশা করি আপনারা কুশলে আছেন।

নিবেদন। ইতি—

আনওয়ার।

পত্রখানা খামে আঁটিয়া তাহার উপর শ্রীযুক্ত আনিছর রহমানের বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া, টেবল উপরিস্থ কলিংবেলে চপেটাঘাত করিলেন।

ক্ষণকাল মধ্যেই মালী পুরুষোত্তম আসিয়া "বাবু ডাকুচেন" বলিয়া উত্তর দিল।

"হাঁ, এই পত্রখানা শীঘ্র ডাকে দিয়ে আয়, আর নিয়ামৎ খাঁকে নীচে থেকে পাঠিয়ে দিয়ে যাস্।"

পত্র হাতে লইয়া পুরুষোত্তম "মু্ষাউচি বাবু"। বলিয়া নামিয়া গেল।

আনওয়ার আলি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন, এবং গ্লাস-কেসের চাবি খুলিয়া, তন্মধ্য হইতে কয়েকখানা সুতি কাপড় বাহির করিয়া, মেঝ্যের উপর স্থাপন করিতে লাগিলেন। এমন সময় নিয়ামৎ খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইল।

আনওয়ার আলি তাহার দিকে ফিরিয়া ও মেহগ্নী কাষ্ঠ নির্ম্মিত বড় আলমারির চাবিটা, রিং মধ্যস্থ চাবি গুচ্ছের ভিতর হইতে বাছিয়া তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন—

স্বপ্নদ্রষ্টা

"দেখ নিয়ামৎ, আমি কিছুদিনের জন্য বিদেশে যাইব। আমার শরীরটা ইদানীং বড়ই খারাপ হয়েছে, তাই মনে ক'রছি দিন কতক পশ্চিমে গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে এলে, একটু উপকার হ'তে পারে। তুমি বড় আলমারিটা খুলে, আমার ফ্লানেলের দুইটি ভাল স্যুট, বনাতের আচকান পায়জামা, দুই তিনটি গরম গেঞ্জি ও ড্রয়ার, তিন জোড়া কাশ্মিরার মোজা, ফেল্ট হ্যাট, আর সে দিন যে খুব নরম টার্কিশ ক্যাপটা এনেছিলাম সেইটি; আর দেখ একটা সাদা সোয়েটার বা'র করে বড় স্যুট কেস্‌টার ভিতর সাজিয়ে দাও!

ভাল কথা, আমার চৌড়া হাসিয়াওয়ালা দোরোখাটা কোথায় আছে খুঁজে বা'র করে ঐ সঙ্গে দাও। আর অন্ততঃ তিনটি ভায়োলা ফ্লানেলের সার্ট যেন দিতে ভুলোনা।"

আনওয়ার আলি নিয়ামৎখাঁকে উপরোক্ত মত উপদেশ দিয়া, নিজে গ্লাসকেস হইতে কয়েকখানা ধুতি ও দুই তিনটি করিয়া সুতি সার্ট ও পাঞ্জাবী এবং একখানি মূল্যবান তাফতার বেপেড়ে চাদর বাহির করিয়া, বড় ট্রাভলিং ব্যাগের মধ্যে সাজাইয়া রাখিতে লাগিলেন; তৎপরে মনে করিয়া করিয়া তন্মধ্যে আয়না, চিরুণী, এস, ক্ষুর ও সাবান আদি নিজ আবশ্যকীয় সমুদয় দ্রব্য সমস্ত ভরিয়া লইলেন।

বৃদ্ধ নিয়ামৎ প্রভুর কথামত আলমারি খুলিয়া, কাপড়, চোপড় বাহির করিতে করিতে, বিমর্ষ মুখে বলিতে লাগিল—"আপনি যাবেন, তোমার গিয়ে আমাকে কিন্তু সঙ্গে নিতে হ'বে। তা' না হ'লে তোমার গিয়ে বিদেশে আপনার বড়ই কষ্ট হ'বে।"

আনওয়ার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "না নিয়ামৎ, তোমার

কোন ভাবনা নাই। খোদা নেগাহ্‌বান। তুমি আমার সঙ্গে গেলে এখানে বাড়ীর দেখাশুনা কে ক'রবে? আমি বরং জাফরকে নিয়ে যা'ব; তোমরা সাবধানে থেকো'। আমি যে কয়দিন বাহিরে থা'কব, তোমাদের নিয়মমত চিঠি পত্র লি'খব। তোমরাও আমাকে আমার প্রেরিত নূতন নূতন ঠিকানায় রোজ একখানা করে লিখতে ভুলোনা।

ইহার পর বেচারা নিয়ামৎ আর কোন কথা বলিতে পারিলনা। মলিন মুখে নীরবে কাপড় বাহির করিতে ও সুট কেসে সাজাইতে লাগিল।

আনওয়ার আলিও, নিজ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল ব্যাগে রাখিতে রাখিতে, নিয়ামৎকে সম্বোধন করিয়া "মালী ও জাফরকে বেডিং আদি ঠিক করিবার ও বাঁধিবার জন্য উপরে ডাকত'" অনুমতি করায়, নিয়ামৎ বারান্দার রেলিংয়ে ঝুকিয়া ডাকিল—

"জাফর, পুরুষোত্তম তোমার গিয়ে ডাকঘর হ'তে ফি'রে এ'লে, তাকে তোমার গিয়ে সঙ্গে নিয়ে শীঘ্র উপরে এস'।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

——:o:——

সাহেবের সঙ্গে বেড়াইতে যাইবে শুনিয়া হিন্দুস্থানী দেশওয়ালী বালক জাফর মহা উল্লাসে ছুটাছুটি করিতেছে। নিজের দরকারী জিনিষগুলি একটি কাপড়ের থলির মধ্যে সাবধানে ভরিয়া রাখিতেছে; এবং অবসর মত খেলার সঙ্গিগণের নিকট বিদায় লইবার জন্য দৌড়িয়া বাহিরে যাইতেছে।

বালসুলভ চাঞ্চল্য দমন করিতে না পারিয়া ব্যস্তভাবে সঙ্গিদিগের কাছে গিয়া, আনন্দাতিশয্যে কাহারও গলা জড়াইয়া ধরিয়া, কাহারও হাত ধরিয়া হাসি হাসি মুখে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলিতেছে—

"হামি ভাই পচ্ছেও চল্‌ছি। ভারি মোজা হোবে। ছেখানে কতকি ছব দেখ্‌বে। উও হাম্‌নিকা মুলুক বা। তা হামি ত লড়ক্‌-পনমে এচেচি ছব ভুল গেয়েছি। খানছামাজী কহ্‌ছে, পচ্ছিমে সমুন্দোর আছে ফিন্ সমুন্দারকা উপর তাজ দালান ভি আছে। ও দেখাল্‌বা। হামি ছব দেখে এছে, তুহাদেরকে বল্‌বে। তাজ দালানকা আন্দারমে কবর ভি আছে। ছে কবরমে ফিন্ কেত হীরে মাণিক লাগান আছে।"

বেচারা জাফর খুসীতে ভূষিত হ'য়ে, খানশামার মুখে যে যমুনা নদীর নাম শু'নেছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে সমুদ্র, ও তাজ মহল্‌কে তাজ দালান বলিয়া; চাক্ষুষ দেখিবার পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়া, অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। আবার হয়ত' গল্পের মাঝে মাঝে, লাটুর সুতা লইতে ভুল হইয়াছে মনে পড়ায়, সত্বর গৃহাভিমুখে ছুটিতে লাগিল।

বালক কাল বড়ই মধুর ও অবিরাম আনন্দময়। বালক বালিকারা কোন ভাল জিনিষ দেখিতে পাইলে, বা কোন ভাল খাদ্য খাইতে পাইলে, কি খেলিবার জন্য কোন সুন্দর খেলনা হাতে পাইলে; যেমন প্রাণের মধ্যে একটা স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করে, ও মুখে তাহা যথা— সাধ্য প্রকাশ করিয়া অনাবিল তৃপ্তি উপভোগ করে। সেই অবস্থা যদি মানবের চিরকাল থাকিত, তাহা হইলে সংসার কি মধুময় হইত।

যাহা হউক আনওয়ার আলির নিরানন্দ ও জাফারের আনন্দের মধ্য দিয়া ভ্রমণোপযোগী সমস্ত তল্পি তল্পা বাঁধা শেষ হইয়া গেল।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় মেল ছাড়িবে। আনওয়ার আলি পূর্ব্বাহ্নে বন্দোবস্ত করিয়া নিজের জন্য একখানা সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে অল্পবয়স্ক ভৃত্য জাফরকে আর অন্য গাড়িতে না দিয়া নিজের সঙ্গে লইয়া যান। কিন্তু মেল-ট্রেণে অর্দ্ধ টিকিটে একটা পুরা বার্থ নিজস্ব করিয়া দিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, অগত্যা উকিল সাহেবকে তাহার জন্য একখানা ইন্‌টার হাফ্‌ টিকিট কিনিতে হইয়াছিল।

ঘরের গাড়ী সওয়া আটটার পূর্ব্বেই উকিল সাহেব, তাঁহার লগেজ

ও পেছনে জাফর এবং কোচবাক্সে ও ছাদের উপর নিয়ামৎখাঁ ও পুরুষোত্তম মালীকে লইয়া ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিল।

ষ্টেশন প্লাটফরমে ওভারকোট গায়ে দিয়া সামান্যক্ষণ পদচারণা করিতে করিতেই, ট্রেণের আলো দেখা দিল ও সঙ্গে সঙ্গে হুস্ হুস্ শব্দ সহকারে, বৃহৎ অজাগরের ন্যায় ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে সম্মুখে ট্রেণ আসিয়া থামিল।

রেলের খালাসিগণকে লইয়া, এবং মালীর সাহায্যে নিয়ামৎখাঁ সমস্ত লগেজগুলি, আনওয়ার আলির নির্দ্দেশ মত তাঁহার রিজার্ভ সিটের উপরে, নিম্নে ও পার্শ্বে গুছাইয়া দিয়া, শেষে বেডিং খুলিয়া বিছানা রচনা করিয়া দিল। এবং টিফিন কেরিয়ারটি বালিশের পার্শ্বেই মেঝের উপর রাখিয়া দিল।

এই সময় আনওয়ার আলি পার্শ্ববর্ত্তী মধ্যম শ্রেণীর কামরায়, জাফরের স্থান করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন।

ছুটির সময়ের মত গাড়িতে ভিড় ছিলনা। সে মার মার, ধর ধর শব্দ নাই। কামরার ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য, দ্বারে দণ্ডায়মান যুবকের সহিত অনুরোধ উপরোধ হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে কড়া কথা হইতে হইতে অভদ্রোচিত অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজ, বা ধাক্কা ধাক্কি ও মার পিটের অভিনয় এখন নাই।

প্রত্যেক ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে, সেই শত শত মানবকণ্ঠের জয়-পরাজয়ের ভীষণ চীৎকার, সকলেরই মুখে ব্যস্ততা ও উত্তেজনকর ভাব ও আমি আগে উঠিব এবং জানালার ধারের সিট্‌টি দখল করিয়া সমস্ত-ক্ষণ দেহে হাওয়া লাগাইব ভাবটি, এ অগ্রহায়ণ মাসের অছুটির সময়ে

নাই। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে নিষ্পেষিত করিয়া, নিজ দুর্জ্জয় বলের পরিচয় দিতে দিতে, পিতলের হাতলটি ধরিয়া অপরের স্কন্ধের উপর দিয়া মধুর কুটুম্ব পাতান "শ্যালার আক্কেল দেখনা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঘাড়ের উপর দিয়ে জুতো শুদ্ধ চলে গেল" প্রভৃতি শুনিতে শুনিতে, বা ওটা কিছুই নয় পাগলের একটা প্রলাপ উক্তি বিবেচনা করিয়া, যেনতেন প্রকারেণ কামরার দরজার ভিতর দেহ গলাইবার আগ্রহ এ সময় নাই।

স্ত্রী কন্যাদিগকে ফিমেল কম্পার্টমেণ্টে তুলিয়া দিতে গিয়া, নিজের দাঁড়াইবার স্থানটি পর্য্যন্ত না পাইবার ভয়, বা ষ্টেশনে নামিয়া তাহাদের খবর লইতে গিয়া, আপনার জায়গাটি হারাইবার ভয়, এখন আর নাই।

এত অত্যাচার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিয়াও, এবং বিপদ আপদ অগ্রাহ্য করিয়াও, যাহাদের চড়্কে পিঠ তাহারা শারদীয় পূজার বন্ধে বেড়াইতে যাইতে ক্ষান্ত হইতে চাহেন না। আমি অবশ্য এ বিষয়ে কাহাকেও উপদেশ দিতেছি না। কারণ নিজেও আমরা এই পথের পথিক ও ভুক্তভোগী।

এই সমস্ত হাঙ্গামা আনওয়ার আলিকে কিছুই পোয়াইতে হয় নাই। তিনি গাড়ীতে উঠিবামাত্র ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা হইল। আনওয়ার নিয়ামৎকে পত্রাদির উত্তর দিতে বলিয়া, ও পুরুষোত্তমকে ফুলবাগানের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার উপদেশ দিয়া ; ট্রেণের হাওয়া খাইবার পরিবর্ত্তে জানালার কাচগুলি বন্ধ করিয়া দিতে লাগিলেন, এমন সময় পুরুষোত্তম জানালার ভিতর মুখ বাড়াইয়া "বাবু তুমড় কোটি থাক, বাড়িড় নওঁবড় দেই কিড়ি আমকত্তিকি ভাসা দব" বলিয়া সরিয়া আসিল।

পেটুক ট্রেণখানি, তাহার সত্ত শূন্য উদর পুনরায় পূর্ণ করিয়া, মহানন্দে "খাবনা ত' কি খে'তে এ'সেছি" বলিতে বলিতে, নির্ব্বাক প্লাটফরমটীকে উপেক্ষা করিয়া রাঙ্গা চোখের লাল জ্যোতি ছড়াইতে ছড়াইতে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। এবং ক্রমশঃ স্পীড্ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বলরামবাটীর শ্যামা পাগ্‌লার অর্থহীন উন্মাদোক্তি "মারত সদাকুল সিপিটক্ পাহালু" অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ট্রেণখানার ব্রেকভ্যানের লাল আলো দেখা গেল বৃদ্ধ নিয়ামৎ ও মালী অপলক নেত্রে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। শেষে গাড়ী দৃষ্টির বাহির হইলে, একটা খুব বড় গোছের নিশ্বাস ফেলিয়া, বিচ্ছেদের বেদনা বুকে লইয়া, বেচারা নিয়ামৎখাঁ তাহাদের গাড়ীতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় অংশ সমাপ্ত।

চতুর্থ অংশ।

—•৵০৵•—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

——:০:——

বম্বে মেল দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে। অন্ধকারে দূরের ও নিকটের গাছগুলি একই ভাবের ঝোপ দেখাইতেছে। একটী যে অপরটী হইতে বিভিন্ন জাতীয় তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

আনওয়ার আলি ওভার কোট ও গাত্রের গরম কোট খুলিয়া, কাষ্ঠ নির্ম্মিত দেওয়াল গাত্রস্থ হুকে ঝুলাইয়া রাখিলেন ও প্যাণ্টের পরিবর্ত্তনে লুঙ্গি পরিধান করিয়া, একখানি র‍্যাগ্ গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

আনওয়ার শুইলেন বটে, কিন্তু ঘুমাইলেন কি না তাহা ঠিক বলিতে পরি না। তবে এই পর্য্যন্ত আমরা অবগত আছি যে, লম্বা লম্বা দৌড়ের পর মেলট্রেণ ষ্টেশনে থামিলেই তিনি কোথায়ও শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া, কোন ষ্টেশনে বা মাথাটি উঁচু করিয়া, বাহিরের দিকে যেন কিসের অনুসন্ধান করিতেন।

যাহা হউক সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত দৌড়াইয়া ট্রেণ ক্লান্ত হইয়া প্রাতঃকাল সাড়ে ছয়টার সময় মোগলসরাই জংসনে পৌঁছিল। আনওয়ার আলি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ইণ্টার ক্লাসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্লাটফরম হইতে জাফরকে ডাকিলেন। জাফর তখনও একখানি পুরাতন র‍্যাগে আপাদ মস্তক ঢাকিয়া বেঞ্চের উপর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিল। কাজে কাজেই উকিল সাহেবকে গাড়ীর মধ্যে গিয়া তাহার গা ঠেলিয়া তাহাকে উঠাইতে হইল।

জাফর উঠিয়াই হঠাৎ একেবারে নূতন জায়গা ও সামনে একটা খুব চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ক'রে মাজা পিতলের বাসন ও নানাপ্রকার পক্ষী ও জীব জন্তুর খেলনার ষ্টল দেখিয়া, অবাক হইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে আনওয়ার আলি ধমক দেওয়ায় নামিয়া আসিয়া হতগুলি পারিয়া উঠিল বুচ্‌কি বোচ্‌কা নামাইয়া লইতে লাগিল।

বেলা নয়টার পূর্ব্বে বেনারশ যাইবার ও, আর, আর লাইনের কোন ট্রেণ না থাকায়, আনওয়ার আলি অতক্ষণ ষ্টেশনে অপেক্ষা না করিয়া একখানি ঘোড়াগাড়ী ভাড়া করিয়া, গঙ্গার সেতুর উপর দিয়া বেনারশে আসিয়া পৌঁছিলেন। উভয় পার্শ্বস্থিত স্বযত্নরোপিত নিম্ব-বৃক্ষের মধ্যবর্ত্তী, ভাগ্যবিতাড়িত মোগল সম্রাট হুমায়ুনের সিংহাসন অধিকারী সের সাহের প্রস্তুত জগৎপ্রসিদ্ধ গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়া বেনারশ নগর প্রান্তে আসিতে, এবং রেলওয়ে সেতুর উপর হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ ধার্‌হারা মস্‌জিদের দুইটি সুদৃশ্য আকাশভেদী মিনারের শোভা দেখিতে দেখিতে, আনওয়ার তাঁহার বিষাদিত প্রাণে এক নূতন আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

একদিন মাত্র কাশীতে থাকিয়া ও নৌকারোহণে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিয়া, বহু প্রাচীন মণিকর্ণিকা, দশাশ্বমেধ ঘাট ও প্রশস্ত সুদৃশ্য গোঘাট এবং তীরবর্ত্তী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুন্দর অট্টালিকা সমূহ নদীগর্ভ হইতে দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপরে নগরাভ্যন্তরে গমন পূর্ব্বক পবিত্র-চেতা ধার্ম্মিক প্রধান বাদশাহ, সম্রাট আওরংজেবের জামো মস্‌জিদ দেখিয়া, তৎপশ্চাতে গিয়া মস্‌জিদ সংলগ্ন দেবমন্দিরের ভগ্নাংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরে জামো মস্‌জিদে জোহরের নমাজ পড়িয়া, চাতাল হইতে নিম্নে দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত প্রস্তরময়, মহাদেবের প্রকাণ্ড বাহন ও কূপ, এবং নিকটেই বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সুবর্ণ মণ্ডিত গুম্বজ ও চূড়া দেখিতে দেখিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাত্রের ট্রেণে সেই দিনই উকিল সাহেব জৌনপুর রওয়ানা হইলেন। কোলাহলপূর্ণ বহু পুরাতন নগর বারাণসীধাম ছাড়িয়া জৌনপুরে আসিয়া যেন তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিন্তু মণিকর্ণিকার ঘাটের পাশাপাশি তিনটি মড়া পোড়ানর বীভৎশ ব্যাপার তাঁহার প্রাণে সর্ব্বক্ষণ অশান্তির সহিত জাগিতে লাগিল।

এখানে গোমতী নদীর উপরস্থ সুপ্রসিদ্ধ সেতু দেখিতে গিয়া, আনওয়ার প্রথমতঃ গোমতীর স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করিয়া দৈহিক তৃপ্তি সাধন করিলেন বটে, কিন্তু প্রিয় বন্ধুর সন্ধানের কোনই সূত্র না পাওয়ায় তাঁহার প্রাণের উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

জৌনপুরের প্রকাণ্ড শাহি মস্‌জিদ দেখিতে গিয়া, আকাশমার্গ হইতে গম্ভীর স্পষ্ট নিঃসৃত আজান ধ্বনি আনওয়ারের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট

হওয়ায়, তিনি কোথা হইতে এই মধুময় আহ্বান আসিতেছে জানিবার জন্য উর্দ্ধ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

আনওয়ার আলি আছেরের নমাজ সমাপনান্তে পুনরায় অনুসন্ধান করিতে করিতে, জানিতে পারিলেন যে পূর্ণ একশত চল্লিশটি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিবার পর ঐ প্রকাণ্ড মসজিদের অত্যুচ্চ গুম্বজের পার্শ্বে যে একটী রেলিংঘেরা উচ্চস্থান রহিয়াছে, ঐ উচ্চস্থান হইতে মসজিদে আজান হইয়া থাকে। এবং তাহাতেই আজানের গম্ভীর শব্দে সমস্ত সহরটি প্রতিধ্বনিত হয়।

কৌতূহল পরবশ হইয়া আনওয়ার তাঁহার ভৃত্য সমভিব্যাহারে ঐ উচ্চস্থানে উঠিয়া নগরের চতুষ্পার্শে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তথা হইতে পশ্চিম দিক ফিরিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রথমতঃ গোমতীর সেতুর উপর, তৎপরে বাম দিকে অপর একটি সুন্দর মসজিদের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়ায়, তিনি নীচে নামিয়া আসিয়া জনগণকে ঐ মস্‌জিদটির নাম ও বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আনওয়ার উহার নাম 'অটলেকি মসজিদ" শুনিয়া ও নামটিতে একটু নূতনত্ব আছে বোধ করিয়া, পরদিন ঐ মসজিদ দেখিতে গেলেন। তথায় গিয়া শুনিলেন যে, ঐটি পূর্ব্বে অটলা দেবীর মন্দির ছিল। সম্রাট আলমগীর উহা ভগ্ন করিয়া মসজিদে পরিণত করিয়াছেন।

শুনিয়া আনওয়ার মনে একটু অশান্তি অনুভব করিলেন। তৃতীয় দিবসে জৌনপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আনওয়ার আলি সকালে

সাড়ে আটটার পর আবার মোগলসরাই জংসনে পৌঁছিলেন। তৎপরে পাঞ্জাব মেলে পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎদূর যাইতেই দক্ষিণ পার্শ্বে উচ্চ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত সের সাহের সংস্কৃত সুদৃঢ় চুণার কোর্ট তাঁহার দৃষ্টি পথের পথিক হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে একণে বৃটিস গভর্ণমেণ্ট দুর্গটির কিয়দংশ তরুণ বয়স্ক অপরাধীগণের শাস্তি ও শিক্ষা দিবার জন্য reformatory স্বরূপ ব্যবহার করিতেছেন।

মেল বেলা বারটার সময় যুক্ত প্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদ ষ্টেশনে আমাদের ভ্রমণকারিকে পৌঁছাইয়া দিল। আনওয়ার আলি সহরের মধ্যবর্ত্তী চওকের নিকটে একটি ছোট দোতলা ঘর ভাড়া লইলেন; এবং চারি পাঁচ দিন তথায় থাকিয়া, চতুর্দ্দিকে বেড়াইয়া বেড়াইয়া বন্ধু ডাক্তারের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

খসরুবাগটি নির্জ্জন স্থান বিবেচনা করিয়া, আনওয়ার দুই দিনে দুইবার তন্মধ্যস্থ প্রত্যেক সমাধি মন্দিরের অভ্যন্তর ও চতুর্দ্দিক, এবং বাগানের চতুষ্পার্শ্ব খুঁজিলেন। খসরুবাগের মধ্যে জলকলের স্থাপনা হওয়ায় সুদৃশ্য শাহি বাগানটির অবস্থা হীন হইয়াছে দেখিয়া আনওয়ারের প্রাণে কষ্ট হইতে লাগিল।

এলাহাবাদে খসরুবাগ দর্শনান্তে ও সমস্ত সহর ঘুরিয়া প্রাণের বন্ধুর কোন সন্ধান না পাওয়ায়, তথা হইতে লাক্ষ্ণৌ যাইবার পূর্ব্বে একবার সম্রাট আকবরের স্থাপিত প্রসিদ্ধ এলাহাবাদ কোর্ট দেখিয়া যাইতে ও তথায় আহম্মদ হোসেনের অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হইল।

আনওয়ার আলি জাফরকে বাসায় রাখিয়া বৈকালে কেল্লা দেখিতে

গেলেন। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলের পার্শ্বেই বিশাল কোর্ট। ফোর্টের মধ্যবর্ত্তী হিন্দুতীর্থ অক্ষয় বটবৃক্ষ দর্শন কামনায়, সুড়ঙ্গ পথ বহিয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ সিন্দুর মাখান কাষ্ঠখণ্ড দেখিয়া, আনওয়ার তাহার সজীবতা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইলেন। বলা বাহুল্য, বৃক্ষটি যে জীবিত, তাহা বুঝাইবার জন্য ভূগর্ভস্থিত পাণ্ডাগণ কোন চেষ্টারই ত্রুটী করে নাই।

এলাহাবাদ হইতে আনওয়ার আলি কাণপুর ঘুরিয়া লাক্ষ্ণৌ আসিলেন। তথায় তিন চারিদিন অবস্থান করিয়া, হিন্দুস্থানের সেই শেষ স্বাধীন রাজধানীর সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ জনপদ, বাজার, চক্ এবং রেসিডেন্সি ও কওসারবাগ প্রমুখ সুন্দর সুন্দর বৈকালিক ভ্রমণের স্থান সকল ঘুরিয়া ডাক্তারের সন্ধানে বিফল মনোরথ হইলেন।

লাক্ষ্ণৌ নগরে নওয়াব আছফদ্দৌলার সুনাম চিরস্মরণকারি সুপ্রসিদ্ধ বৃহদায়তন এমামবাড়া, তদুপরিস্থিত আশ্চর্য্য ভাবে নির্ম্মিত ভুল-ভোলাঁইয়া বা গোলকধান্দা; এবং পার্শ্ববর্ত্তী কারুকার্য্য খচিত সুদৃশ্য মসজিদ দেখিতে গিয়া আনওয়ার আলি মসজিদে বৈকালিক নমাজ পড়িলেন।

নমাজান্তে অযোধ্যার শেষ নওয়াব ওয়াজেদ আলি সাহের ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের এবং অন্যান্য বহু স্বাধীন রাজন্যবর্গের প্রতিমূর্ত্তি সম্বলিত আজায়েব খানা দর্শনান্তে বাসায় ফিরিয়া, সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেণে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ভোরের সময় ট্রেণ টুণ্ডলা জংসনে পৌঁছিল ও প্রত্যূষে আনওয়ার আগ্রা ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ী পাইলেন। দুইটী ষ্টেশন পার হইবার পরেই

বামদিকে দূরবর্ত্তী জগৎ প্রসিদ্ধ তাজমহলের অত্যুচ্চ ডুম ও মিনারেট চতুষ্টয় দৃষ্টি পথে পতিত হওয়ায়, প্রথমতঃ আনওয়ারের হৃদয় পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল; কিন্তু কি জানি কেন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া প্রকটিত হইল।

আনওয়ার অন্যমনস্কভাবে যমুনার পরপারে আগ্রাফোর্ট ষ্টেশনে অবরোহণ করিলেন ও ষ্টেশনের নিকটেই একটি হোটেলে আলাহিদা একত্রে দুইটী সুসজ্জিত কক্ষ ও তৎসংলগ্ন একটী রান্নাঘর ভাড়া লইলেন।

সেই দিনই আহার করিয়া অল্প বিশ্রামান্তে, আনওয়ার আলি একখানি গাড়ী লইয়া তাজমহল দর্শনার্থে বাহির হইলেন।

অর্দ্ধঘণ্টাপেক্ষা অল্প সময় মধ্যে অশ্বযান যমুনার তীর দিয়া তাঁহাকে তাজের গেটের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া, চালক অপেক্ষা করিবে কি না জিজ্ঞাসা করায়, তিনি গাড়ওয়ানকে ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

প্রকাণ্ড গেটের মধ্যে ঢুকিয়া, সম্মুখস্থ চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় অদূরবর্ত্তী তাজমহলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আনওয়ার আলি ক্রমশঃ রক্তবর্ণ প্রস্তরময় পথ দিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে হইতে তাজের চাতালে উঠিবার সিঁড়ির পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আনওয়ার তুমি পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া ওখানে ওরূপভাবে বসিয়া রহিয়াছ কেন? ও কি! তোমার দু'নয়নে যে বারিধারা বহিতেছে! তুমি তাজের গুম্বজের নিম্নে শাহানসাহ শাহজাহানের বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত অতি সুন্দর পাচ্চাকারি কার্য্যখচিত শ্বেত প্রস্তরময় বহুমূল্য রত্নরাজি সম্বলিত মনোমুগ্ধকর জাফ্‌রির ভিতর তাঁহার কবরের পার্শ্বে বসিয়া, ও কি করিতেছ? ওঃ! তুমি মর্ম্মর প্রস্তর গঠিত কবরদ্বয়ের উপরে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, বহু মূল্যবান রত্নগুলির চাকচিক্য নিরীক্ষণ করিতেছ! না, তা'ত নয়, তা' হ'লে তোমার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতেছে কেন?

বুঝেছি, তুমি বাদসাহের বাম পার্শ্বে শায়িতা চির নিদ্রাগতা তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহলের প্রতি সম্রাট শাহজাহানের গাঢ় প্রেম চিন্তা করিয়া, তৎসঙ্গে নিজ অদৃষ্ট ও সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা পত্নীর সহিত চির বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া, দারুণ মনোকষ্টে ও দুঃখে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেছ না।

অনেকক্ষণ এইরূপ বসিয়া থাকার পর আনওয়ার উঠিলেন। বালক ভৃত্য জাফর তাজের মধ্যেই এদিক ওদিক দেখিয়া বেড়াইতেছিল।

তাহার মনে সাধ হইতেছিল যে এই সুন্দর সুন্দর দৃশ্যগুলি চক্ষের মধ্যে পুরিয়া লইয়া বা কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া, ফিরিয়া আসিয়া তাহার পুরাতন বন্ধু ও খেলার সঙ্গীগণের নিকট প্রকাশ করে।

এমন সময় প্রভুর ডাক তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেই জাফর সেই দিকে ছুটিয়া গেল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া আনওয়ার আলি ঠিক সন্ধ্যার সময়ে বাসায় ফিরিলেন।

সমস্ত রাত্রি বাদসাহ শাহজাহান ও তদীয় মহিষীর মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসার সহিত, নিজের ও প্রিয়তমা পত্নীর পবিত্র প্রণয় তুলনা করিতে করিতে তাঁহার চক্ষে সে রাত্রে নিদ্রাকর্ষণ হইল না।

প্রত্যুষে পশ্চাতের বৃহদায়তন জাম্মে মসজিদ হইতে গম্ভীর স্বরে আজান ধ্বনি শুনিয়া, আনওয়ার তাড়াতাড়ি শাহি মসজিদে নমাজ পড়িতে গেলেন।

সেইদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আনওয়ার আলি বাদসাহ হুমায়ুন-পুত্র জগৎপ্রসিদ্ধ সম্রাট জালালউদ্দীন মোহাম্মদ আকবর বাদসাহের সমাধি সেকেন্দারা দেখিতে গেলেন; ও তদনন্তর যমুনার পরপারে জাহাঙ্গীরমহিষী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পিতা, অমাত্য-প্রধান এতমাদদ্দৌলার সমাধি মন্দির ও তদভ্যন্তরস্থ দুষ্প্রাপ্য প্রকাণ্ড পীত মার্ব্বেল নির্ম্মিত কবর দর্শনে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করিলেন।

তৃতীয় দিবসে ভ্রমণকারী আকবর বাদসাহের বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত গগণস্পর্শী প্রাকার বেষ্টিত সুদৃঢ় ফোর্ট ও তন্মধ্যস্থ বাদসাহ পৌত্রের স্বপ্ন বিনির্ম্মিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অতীব মনোহর প্রাসাদ ও উপাসনা মন্দির সকল দেখিতে বাহির হইলেন।

কেল্লার প্রকাণ্ড গেট পার হইয়া, তন্মধ্যস্থ রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইবার কালীন পথ পার্শ্বস্থ ইতিহাস প্রসিদ্ধ জগৎবিখ্যাত মতি মসজিদের অত্যুচ্চ সিঁড়ির উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

আনওয়ার গাইড সমভিব্যাহারে সসম্ভ্রমে পাদুকা উন্মোচন করিয়া সুরম্য মসজিদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ও অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার নির্ম্মাণ কৌশল মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে বেলা তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায় দেখিয়া, আনওয়ার আলি প্রদর্শককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন —

"জাঁহা পর বাদসাহ শাহজাহানকা আখেরি দম নিকলাথা, উস্ কোঠ্‌রীমে হামে লেচলো।"

গাইড "যো হুকুম হুজুর" বলিয়া আনওয়ার আলিকে, দেওয়ান আমের অভ্যন্তর দিয়া লইয়া, একবার মাত্র ক্ষুদ্রায়তন সুদৃশ্য নগীনা মসজিদটি দেখাইয়া, ক্রমে মচ্ছিভবন ও দেওয়ান খাসের ভিতর দিয়া গিয়া একেবারে যমুনা তীরবর্ত্তী বারাণ্ডার উপর, শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত অতীব সুরম্য অষ্টকোণ বিশিষ্ট কক্ষ, যাহার মধ্যে শায়িতাবস্থায় শাহান্‌সাহ শাহজাঁহান, দূরে পূর্ব্বদিকস্থিত, প্রিয়তমা মহিষীর চির নিদ্রাবাস তাজমহল দেখিতে দেখিতে জন্মের মত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিলেন, তথায় লইয়া গেল।

আনওয়ার বহুক্ষণ ধরিয়া কক্ষাভ্যন্তর হইতে, বাদসাহ দম্পতির চির নিদ্রালয় ও তাহার সুচারু শোভা দর্শন করিতে করিতে, ভাবিতে লাগিলেন; হায়! এই স্থানেই শায়িত থাকিয়া মুমূর্ষু সম্রাট দূরবর্ত্তী প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে দেখিতে ও তাঁহার পবিত্র প্রেম চিন্তা

করিতে করিতে, হৃদয়ে দারুণ শোক লইয়া, চির বিশ্রামের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়া ছিলেন।

চিন্তানিমগ্নাবস্থায়, অজ্ঞাতসারে প্রেমাশ্রু আনওয়ার আলির চক্ষু তড়াগদ্বয়ের বাঁধ উথলিয়া নিম্নগামী হইয়া, কক্ষের বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত মেঝে ভাসাইতে লাগিল।

আনওয়ার ঐ শীতল কক্ষতলে অনেকক্ষণ বসিয়া নিজ সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা পত্নীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে উঠিয়া দাড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিতেই গৃহভিত্তি গাত্রে সন্নিবিষ্ট বহু মূল্যবান প্রস্তর খচিত প্রত্যেক ফুল ও পত্র গুচ্ছের মধ্যস্থিত, গাঢ় সবুজ বর্ণের পান্না গুলির ভিতর, এক মাইল দূরবর্ত্তী জগৎপ্রসিদ্ধ অতুলনীয় তাজের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার নির্ম্মাণ কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ফোর্টের মধ্যেও আনওয়ার আলির অনুসন্ধান-ইপ্সু চক্ষুদ্বয় সর্ব্বত্র তাঁহার প্রিয় বন্ধুর সাক্ষাৎ আশায় ইতঃস্তত: বিচরণ করিতেছিল। শেষে বিফল মনোরথ হইয়া আনওয়ার বাসায় ফিরিলেন।

আগ্রায় আর একদিন মাত্র অবস্থান করিয়া, আনওয়ার বি, বি, সি, আই লাইনের ছোট রেল দিয়া প্রথমত: মথুরায় ও তথা হইতে শ্রী শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র ও আধুনিক পরমভক্ত বৈষ্ণব বৈষ্ণবীগণের ধর্ম্মার্জ্জনের উত্তমাঙ্গ পরকীয় রসাস্বাদনের পবিত্র স্থান, শ্রীবৃন্দাবনধামে উপনীত হইলেন।

বৃন্দাবনে যাইবার সময় আনওয়ার আলি ট্রেণে না গিয়া, গোচারণের মাঠ ও গোঠ দেখিতে দেখিতে যাইবার ইচ্ছায়, মথুরা হইতে

বরাবর ঘোড়ার গাড়ীতেই গিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া তিনি রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী, মান-সিংহের লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃশ্য মন্দিরের অনতিদূরে স্থাপিত বৃহৎ মস্‌জিদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দুইদিন বৃন্দাবনে থাকিয়া, ভজনকুঞ্জ, চীরঘাট, বংশীবট ও তৎ-সংলগ্ন মন্দিরগুলি; এবং শেটজীর মন্দিরের প্রাঙ্গনস্থিত স্বুবর্ণ মণ্ডিত বৃহৎ তালবৃক্ষ ও সাহজীর মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত বৃহদায়তন মন্দিরের কারুকার্য্য খচিত স্ক্রু প্যাটার্ণের মার্ব্বেলস্তম্ভ সকলের আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ কৌশল দেখিতে ও তৎসঙ্গে বানরের প্রবল দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে লাগিলেন।

বৃন্দাবনে কোন সন্ধান না পাওয়ায়, আনওয়ার আলির মনে হইল, হয় ত' ডাক্তার সাহেব পবিত্র তীর্থ আজমীর শরীফে গিয়া অবস্থান করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৃন্দাবন ষ্টেশনে আজমীরের টিকিট কিনিয়া আছ্‌নিয়ারা জংসন দিয়া আজমীব শরীফে পৌঁছিলেন।

আজমীরে হজরৎ খোয়াজা মঈনউদ্দীন চিস্তির মজার শরীফের দৃশ্য অতীব মনোমুগ্ধকর। এখানে সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই প্রবেশাধিকার সমান।

আনওয়ার আলি দুই তিন দিন ধরিয়া সন্ধ্যা, সকাল, দরগাহের দ্বার বন্ধ হইবার সময় রাত্রি ১১টা ও পুনরায় খুলিবার সময় ভোর তিনটায় মজার জেয়ারৎ করিয়া, মনে তৃপ্তি ও প্রাণে অনির্ব্বচনীয় শান্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

যে কয়দিন তিনি আজমীরে ছিলেন প্রত্যহই দরগাপ্রাঙ্গনস্থিত

সম্রাট শাহজাহানের স্থাপিত মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত মস্‌জিদে মগরেবের নমাজ পড়িয়া, একাগ্রচিত্তে তন্ময় হইয়া হজরত খোয়াজা সাহেবের গুণ-কীর্ত্তন সুমধুর কাওয়ালী শুনিতেন। কোন কোন রাত্রে সম্রাট আক্‌বরের মস্‌জিদে এসার নমাজ পড়িয়া দরগাহ প্রাঙ্গন পরিত্যাগ করিতেন।

কয়েক দিন ধরিয়া আজমীরে অবস্থান পূর্ব্বক, তারাগড় পাহাড়, আনাসাগর হ্রদ প্রভৃতি দর্শনে ও নানাস্থানে প্রিয় বন্ধুর অনুসন্ধানে বিফল মনোরথ হইয়া, আনওয়ার আলি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পথে জয়পুর রাজার উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত সুদৃশ্য রাজধানী দর্শনেচ্ছায় জয়পুর রেলওয়ে ষ্টেশনে নামিলেন।

জয়পুরের প্রশস্ত প্রশস্ত সুন্দর সরল রাস্তা সকল ও উভয় পার্শ্ববর্ত্তী একই ধরণের অট্টালিকা শ্রেণী দেখিয়া, আনওয়ারের প্রাণে একাধারে আনন্দ ও তৎসঙ্গে প্রিয় বন্ধুর অদর্শনজনিত বিষাদ অনুভূত হইতে লাগিল।

বৈকালে আনওয়ার আলি জাফর সমভিব্যাহারে, এডওয়ার্ড-মেমোরিয়ালের ভাড়া-লওয়া কামরাদ্বারে তালা বন্ধ করিয়া জয়পুর রাজার মনোহর উদ্যান রামনিবাস ও তদভ্যন্তরস্থ মিউজিয়াম্‌ দর্শনে বহির্গত হইলেন।

মহারাজা নিজ রাজধানীটিকে সর্ব্বসুখ ও বিলাসের আকর করিয়া রাখিবার ইচ্ছায় বহু অর্থব্যয়ে রাজপুতানার মরুমধ্যবর্ত্তী স্থানে সমস্ত দিবারাত্র কলের জল সমভাবে যোগাইবার উদ্দেশে, এই উদ্যান মধ্যে

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইন্দারা খনন করিয়া জল কলের স্থাপনা করিয়াছেন।

আনওয়ার রামনিবাসবাগ মধ্যে ওয়াটার ওয়ার্কস্, মহারাজার মিউজিয়াম্ এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতি বৃহদায়তন হিংস্রজন্তুসম্বলিত পশুশালা দর্শনান্তে; সাওন্-ভাদো নাম উল্লেখে, শীতপ্রধান ভূখণ্ডের নানারকমের পাতা বাহার ও ফুলের গাছ সকল, নিয়তঃ জলসিঞ্চন দ্বারা ছায়াতলে অতি যত্নের সহিত যে ভাবে এই উষ্ণপ্রধান প্রদেশে রক্ষিত হইতেছে; সেই সযত্নরক্ষিত সেড্গুলি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আছেরের নমাজের সময় উত্তীর্ণ প্রায় দেখিয়া, উদ্যান মধ্যে ও বাহিরে পথের ধারে স্বাধীন ভাবে ময়ূর ময়ূরার বিচরণ দেখিতে দেখিতে বাসায় ফিরিলেন।

সন্ধ্যার পর আনওয়ার অবরোধ প্রাচীরের মধ্যে বেড়াইতে গিয়া, নগর মধ্যস্থ সুদৃশ্য রাস্তাগুলির প্রত্যেক চৌমাথায় এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজার বসিয়াছে দেখিতে দেখিতে রাত্রি নয়টার সময় বাসায় আসিলেন।

পর দিবস মেলট্রেণে আনওয়ার আলি দিল্লী যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

——:*:——

দিল্লী পৌঁছিয়া আনওয়ার আলি নেয়ামৎ খাঁর নামে ও বাড়ীর ঠিকানায় হাফেজ সাহেবের পুত্র আনিছর রহমানের নামে, দিল্লীর আবাস স্থানের ঠিকানা দিয়া, এবং দিল্লী হইতে ফিরিবার কালে তিনি জব্বলপুর যাইবেন ও তথায় পোষ্ট মাষ্টারের কেয়ারে তাঁহার নামে পত্র লিখিতে উপদেশ দিয়া, দুইখানি পত্র লিখিলেন; এবং ডাক্তার সাহেবের বিষয় কিছু অবগত হইলেই তাঁহাকে সত্বর তার করিতে বলিয়া দিলেন।

আনওয়ার মোগল সম্রাটগণের পুরাতন রাজধানী দিল্লী নগরীর সৌন্দর্য্য ও নগরমধ্যস্থ সৌধাবলীর এবং সুন্দর সুন্দর মস্‌জিদগুলির বিবরণ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন মাত্র। এক্ষণে স্বচক্ষে ঐ সমুদয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন।

সর্ব্বপ্রথমেই তিনি জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ভজনমন্দির অতীব সুদৃশ্য জাম্মে মস্‌জিদে গিয়া জোমার নমাজ পড়িলেন। নমাজের সময় আনওয়ার মস্‌জিদে বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন বেশধারী বহু লোকের ভিড় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

স্বপ্নদৃষ্টা

মধ্যাহ্নান্তে আনওয়ার আলি এই প্রকাণ্ড মসজিদের সকল স্থান ও সমস্ত দ্রব্য তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া নয়নে তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। এমন সময় মসজিদের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। ঐ স্থানটী প্রাঙ্গন বেষ্টিত বারাণ্ডার ছাদের নিম্নে অবস্থিত।

আনওয়ার তথায় যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন বৃদ্ধ আসিয়া, সযত্নরক্ষিত একটি বৃহৎ আলমারির মধ্য হইতে বাহির করিয়া, তাঁহাকে একটি রৌপ্য নির্ম্মিত কৌটার মধ্যে কাঁচের আবরণে ঢাকিয়া রাখা হজরৎ রসুলে-খোদার ص একগাছি রিশ মোবারক (পবিত্র দাড়ি) দেখাইলেন। তৎপরে শেষ নবীর ص ব্যবহৃত কাপড়ের সামান্য একটু টুকরা ও পবিত্র চরণের জুতার ছেঁড়া একটু অংশ (নালায়েন শরীফ) প্রভৃতি দুই চারিটী মহাপবিত্র দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য দেখাইতে লাগিলেন।

আনওয়ার আলি ঐ সমস্ত পবিত্র দ্রব্যের প্রত্যেকটী যত্নের সহিত হস্তে লইয়া তাহাতে চুম্বন দিতে লাগিলেন। শেষে বৃদ্ধকে কিছু দিয়া বিদায় হইলেন।

পরদিন রক্তবর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত, অভ্রভেদী সুদৃশ্য প্রাচীর বেষ্টিত ফোর্টের মধ্যে, চির প্রসিদ্ধ রাশিকৃত সৌন্দর্য্যের আধার "ভূস্বর্গ" দেওয়ান-খাস্ দেখিয়া, আনওয়ার তন্ময় হইয়া ইহার নির্ম্মাণ কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তথা হইতে পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্রায়তন অতীব মনোহর মতি মসজিদ দেখিতে গিয়া, দুই প্রহরের রৌদ্রে মসজিদের দুগ্ধফেননিভ মর্ম্মর প্রস্তরের ভিত্তির দিকে তাকাইতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু যেন ঝলসিয়া

যাইতে লাগিল। শেষে আর একদিন সকালে বা সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া দেখিব মনে করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আধুনিক ইংরাজ রাজধানী দিল্লী, রেলওয়ে লাইনের অপর পার্শ্বে অবস্থিত। আনওয়ার এই নূতন জন-সমাগম-শূন্য দিল্লী ও নগর প্রাকারের বাহিরের পাঠান সম্রাটগণের সময়ের কঙ্কালসার দিল্লী; এবং আরও দূরে অবস্থিত পৃথ্বীরাজের সময়ের পুরাতন দিল্লী; এই সকল স্থানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজের ঠাকুর বাড়ীর পার্শ্বস্থ মোসলেম বিজয়স্তম্ভ কোতবউদ্দীনের স্থাপিত সুপ্রসিদ্ধ কোতবমিনারের উচ্চতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া, আনওয়ার আলির ঐ স্তম্ভের চূড়ায় উঠিতে ইচ্ছা হইল।

তিনশত সত্তরটির অধিক সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, মিনারের উপর উঠিয়া তথা হইতে মধ্যপথ স্থিত সম্রাট আকবরের পিতা জগৎপ্রসিদ্ধ কষ্ট-সহিষ্ণু বাদসাহ হুমায়ুনের সমাধি ও দিল্লীর জুমা মসজিদের প্রসারিত দুইটী উর্দ্ধবাহুরন্যায় মিনারদ্বয় দেখিতে পাইলেন।

ফিরিবার পথে আনওয়ার আলি, হুমায়ুনের টুম্ব ও তাঁহার পুস্তকাগার, যাহার সিঁড়ি হইতে নামিতে গিয়া বাদসাহ আহত হইয়া মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়েন; এবং সের সাহের মসজিদ, নেজামদ্দীন আউলিয়ার মজার প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার পর বাসায় পোঁছিলেন।

হজরৎসাহ নেজামদ্দীনের দরগাহ প্রাঙ্গনে তিনি অনেকগুলি মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবর দেখিতে পাইয়া, এই সকল কাহাদের চিরবিশ্রামের স্থান জানিবার ইচ্ছায়, আনওয়ার উহাদের

নিকটবর্ত্তী হইয়া, কবরের উপরের লেখাগুলি পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

পড়িতে পড়িতে একটী জাঁকজমক বিহীন কবরের, কেবল এক-পার্শ্বে একখানি প্রোথিত প্রস্তর খণ্ডের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়া উহাতে কি লেখা আছে পড়িতে লাগিলেন।

ঐ প্রস্তর ফলকে উল্লেখ ছিল যে উহা শাহান্‌সাহ পরম ধার্ম্মিক বাদসাহ মুহিউদ্দীন মহম্মদ আলমগীরের প্রিয়তমা বিদুষী পরম পবিত্র-চিত্তা, চিরকুমারী কন্যা বাদসাহজাদী জেবন্‌ নেছার মৃন্ময় গোর। এবং তাঁহারই চির বাঞ্ছিত আদেশানুসারে তাঁহার এই আড়ম্বরশূন্য কবরের উপর একখানি প্রস্তরে সম্রাটনন্দিনীর নিজ রচিত এই কবিতাটী লেখা ছিল—

"بغیر سبزۂ نپو شد کسی مزار مرا
کہ قبر پوش غریباں ہمین گیاہ بس است"

অর্থাৎ—হরিৎবর্ণ (দূর্ব্বাদল) ব্যতীত কেহ যেন আমার কবর-আচ্ছাদনের অন্য কোন ব্যবস্থা না করেন।

কারণ (পারলৌকিক) সঙ্গতিহীনগণের সমাধির পক্ষে এই তৃণাবরণই যথেষ্ট।

আনওয়ার আলি দিল্লীর রাজ অন্তঃপুরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিলাসিতার মধ্যে ভোগবিলাস-স্পৃহা শূন্য বাদসাহ-নন্দিনীর, এই ত্যাগের উদাহরণে মোহিত হইলেন ও সমস্ত পথ এই অশ্রুতপূর্ব্ব নিস্পৃহ রাজ-নন্দিনীর বিষয় গৌরবের সহিত চিন্তা করিতে করিতে বাসায় ফিরিলেন।

আনওয়ার দিল্লীতে অবস্থান কালে, তথায় যথাসাধ্য তাঁহার বন্ধুর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন খবরই না পাওয়ায়,

শেষে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া, আর কোথায়ও না গিয়া বরাবর বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন।

ট্রেণে একজন ইংরাজ পর্য্যটকের সহিত তাঁহার খুব আলাপ হইল। এবং কথা প্রসঙ্গে ঐ ইউরোপীয় বন্ধুটি তাঁহার নিকট জব্বলপুর মার্ব্বেল পাহাড়ের ও উক্ত পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী নর্ম্মদা নদীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিলক্ষণ প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে একবার জব্বলপুর যাইতে অনুরোধ করায়, আনওয়ার আলিও সাবেক বন্দোবস্ত মত জব্বলপুর যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

আনওয়ার পুনরায় এলাহাবাদ ষ্টেশনে নামিয়া, রাত্রের ট্রেণে জব্বলপুর যাত্রা করিলেন। প্রাতঃকালে চুণের উৎপত্তিস্থান সাট্না, কাট্নি প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে বেলা ৯টার মধ্যে জব্বলপুর ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, রাজা গোকুল দাসের প্রকাণ্ড মেমোরিয়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ঐ ধর্ম্মশালাটির বন্দোবস্ত স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর হস্তে ন্যস্ত হওয়ায়, ভ্রমণকারীগণের উহাতে তিন দিন থাকিবার পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হইয়াছে।

আনওয়ার তথায় থাকিয়া সমস্ত নগর পরিভ্রমণ, সুদৃশ্য গোবর্দ্ধন ভবন ও বাগান, এবং ক্যানটনমেণ্ট ও নাত্যুচ্চ পাহাড়গুলির উপর পল্টন থাকিবার ব্যারাক সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

——:o:——

"আসুন, আসুন, ঐ দেখুন আসামী!" জনতা মধ্য হইতে অকস্মাৎ এই শব্দ উত্থিত হওয়ায়, সেখানে নিকটে যে কয়জন লোক ছিল, বিস্মিতভাবে সকলেই সেই দিকে চাহিল। দেখিল দুইজন বাঙ্গালী উদ্ধশ্বাসে সম্মুখের লোকগুলিকে ঠেলিয়া দৌড়িতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন প্রৌঢ় ও অপরটি যুবা।

ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সকলেই স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। চক্ষের নিমিষে লোক দুইটী দৌড়িয়া গিয়া শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট একটী যুবকের নিকট উপস্থিত হইয়া অতর্কিত ভাবে পশ্চাৎদিক হইতে তাহার গ্রীবাদেশ ধারণ করিল।

হঠাৎ সবল হস্তের গলা টিপুনি খাইয়া ধ্যানমগ্ন যুবক চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ঘাড় ফিরাইয়া মধুর হাস্যের সহিত আক্রমণকারীকে অভিবাদন করিল।

প্রৌঢ় —"থাক্ থাক্ অত সাধুতায় কাজ নেই, একজনের সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে এখানে এসে সাধুগিরি ফলান হচ্ছে"। অনন্তর সঙ্গী যুবকের দিকে চাহিয়া—

"দেখ্‌চ কিহে, আসামী চালান দিবার ব্যবস্থা কর" বলিয়া ধৃত ব্যক্তির হস্তদ্বয় বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে, সে বিনীত ভাবে বলিল—

"বাঁধবার দরকার নেই, পালা'বনা, কোথায় যেতে হ'বে বলুন?" প্রৌঢ় ব্যঙ্গস্বরে উত্তর করিলেন—

"কোথায় যেতে হ'বে তা' কি ম'শাইয়ের জানা নেই? না থাকে শুন, হাজতে বাবু হা—জ—তে। এই বার বোধ হয় বু'ঝতে আর বাকি থা'ক্‌লনা, কেমন?"

যুবক বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল—

"তাত' বু'ঝতে পে'রেছি, তবে এবারটি আমায় ক্ষমা করুন।"

"ক্ষমা! তোমায় ক্ষমা! তুমি এখনও ক্ষমার আশা রাখ? বড় বড় দাগিচোরকে ক্ষমা করা যায়; কিন্তু তোমাকে কোন মতেই ক্ষমা করা চলে না। তুমি কি কম কষ্ট দিয়েছ; তোমাকে ছা'ড়তে হ'লে আমাদের এত কষ্ট করার পর, এই ইণ্ডিস্‌মিণ্ডিসের দেশে এসে যে পারিতোষিকটা পা'বার আশা হ'য়েছে, সেটুকু ছা'ড়তে হয়; অধিকন্তু এই কষ্টের পর আবার কি লাঞ্ছনাটা ভু'গতে হ'বে বল দেখি?"

এই বলিয়া প্রৌঢ় তাহার দক্ষিণ হস্ত সজোরে চাপিয়া ধরিলেন, এবং বামহস্ত খানা ধরিবার জন্য সঙ্গীকে ইঙ্গিত করিলেন।

যুবক পুনরায় মলিন মুখে বলিল—

"আচ্ছা এখনও আপনাদের ভয় হ'চ্চে যে আমি পালা'ব? মহাশয়দের এত পরিশ্রমজনিত বকশিস্‌ পাবার আশা পণ্ড ক'রবার ইচ্ছা আমার নেই। এখন আমাকে নিয়ে যা' কর্ত্তে চ'ান করুন।"

"কাজেই, পাথর শক্ত না মাথা শক্ত, তুমি এটা খুবই বু'ঝেচ যে যম-

দূতের ন্যায় এরা দুটো যখন আমাকে ধরেছে, তখন যে সহজে ছা'ড়বে তা'র আর আশা নাই। বাপরে, তোমার জন্য কি ভোগনটাই ভুগেছি ! সেই কাঁচা খেকোর দেশ থেকে আরম্ভ করে শেষে গড়িয়ে গড়িয়ে এই কিঁউড়ি মিঁউড়ির মুলুকে এসে ত'বে তোমার পাত্তা পাই। আর একজন যে কোন রাজ্যে গিয়ে হা'তড়ে বেড়াচ্চে তার ঠিকানাই নেই। তোমাকে আবার বিশ্বাস !"

"স্বীকার করি আপনাদের গোয়েন্দাগিরী তারিফের যোগ্য" বলিয়া যুবক তাহার হস্তধারী ব্যক্তিদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিল। তাহারাও গৌরবের হাসি ঠোঁটের উপর চাপিয়া, যুবকের দুই হাত দুইজনে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সে বেচারাও তখন আর আত্ম-রক্ষার উপায় নাই দেখিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও তাহাদের সহিত যাইতে বাধ্য হইল।

এইরূপে ঐ ক্ষুদ্র জনতার মধ্য দিয়া যুবককে দুই হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার কালে, সকলেই বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে তাহার দিকে চাহিতে লাগিল।

বৃদ্ধাগণ, তাহাদের দেশের স্বভাবসূচক কথা বলিবার আগে বারকয়েক মাথা নাড়িয়া, বলিতে লাগিল— "আহা ! কোন অভাগীর ছেলে, চেহারা ত' নয় যেন রাজপুত্তুর। কি অপরাধেই বেচারি ধরা প'ড়্‌ল। মুখ দে'খে ত' চোর ব'লে কিছুতেই অনুমান হয় না। মুখ-খানি দেখ না, যেন শুকিয়ে গিয়েছে !"

যুবতীরা দেখে—

" মা গো দুটো দুটো লোকে কি ক'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে ! হয়

ত' বিনা অপরাধেই ওকে জেলে যে'তে হ'বে। আহা! ওর স্ত্রী অমন কার্ত্তিকের ন্যায় স্বামীকে ছেড়ে কি ক'রে থাক্‌বে!"

বৃদ্ধগণ—"বাবা পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়া বড় সোজা কথা নয়। দে'খ্‌চনা, টিকটিকি ব্যাটারা পোষাক বদ্‌লে কেমন ভদ্রলোক সেজে গপ্‌ করে' এসে' ধরে' ফেল্লে। লোকটা যে কি দোষে দোষী বলা যায় না। আর ডিটেক্‌টিভ দু'জনকে জিজ্ঞেস ক'ল্লেও ওরা এখন ব'লবে না। তবে চোর বলে' ওকে কিছুতেই অনুমান হয় না। হ'তে পারে বয়স দোষ যা'কে বলে সেই রোগ ধরেছে। তা' দেখনা হতভাগা ছোড়াগুলো ঠেকেও শেখে না। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।"

যুবকগণ—"এখন পালাবে কোথা বাছাধন। এ টিকটিকির দৃষ্টি সাপের চোখকেও হার মানায়। কিন্তু ভাই লোকটাকে দেখে যেন মন্দ লোক ব'লে বিবেচনা হয় না।"

একজন বলিয়া উঠিল—"তুমি বোঝনা হে, দু'চারটে সুন্দর মুখ না থা'ক্‌লে, আর তাদেরকে দেবচরিত্র বলে বিশ্বাস না ক'রলে. স্বামী-হারা কুলকামিনীগণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'বে কি ক'রে? তা' হ'লে তা'রা সকলেই হয় প্রকাশ্য বেশ্যা, না হয় সতী সাবিত্রী হ'য়ে প'ড়ত।"

এইরূপ নানা লোকের রকমারি অস্ফুট গুঞ্জন কিছু কিছু ধৃত ও ধৃতকারী ব্যক্তিত্রয়ের কাণে পৌছিল ও তাহারা সকলেই মুখ চাওয়াচায়ী করিতে লাগিল। ধৃত ব্যক্তির মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

পূর্ব্ব বর্ণিত ডিটেক্‌টিভদ্বয় যুবককে ধৃত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই তিনটী পাহাড় উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক জনসমাগমের ভিতর দিয়া আসিয়া, পথে

নৌকারোহণে একটী নাতিপ্রশস্ত নদী পার হইলেন।

নদীর পরপারে বাণ্ডে নামধারি কংকগুলি, একটী করিয়া মাত্র বলদ জোড়া প্যাছেল্লার বাহি ভাড়াটিয়া গরুর গাড়ী দাড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। প্রৌঢ় গোয়েন্দা "বাণ্ডে ওয়ালে" বলিয়া ডাকবামাত্র দূর হইতে দুই তিনজন চালক, নিজ নিজ গাড়ীর গরুগুলিকে ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়ার ন্যায় দৌড় করাইয়া, তাহাদের নিকটে পৌছিল।

গাড়ীতে উঠিবার পর গরু দৌড়িতে দৌড়িতে, অতি অল্প সময় মধ্যে আরোহীত্রয়কে ভাইজাগাপাটাম্ পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফসের সম্মুখে পৌঁছিয়া দিল।

যুবক গোয়েন্দা তাড়াতাড়ি নামিয়া, অফিসের ভিতর গিয়া একখানি টেলিগ্রাফের ফরম চাহিয়া লইলেন ও তাহাতে কি লিখিয়া ঐ ফরমখানি ও হিসাব মত খরচা তার কেরাণীর হস্তে দিলেন।

তৈলঙ্গ দেশ নিবাসী ক্লার্কটি টেবিলের উপর বাম দিকে ঐ কাগজ খানি রাখিয়া এক একবার উহার দিকে দেখিতে ও সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী সাহায্যে টেবলের উপরিস্থ ক্ষুদ্র ঢেঁকিকল্‌টিতে টক্কাটরে, টরেটক্কা টক্কা শব্দ করিতে আরম্ভ করিল।

যুবক সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঐ টক্কা টক্ক দেখিতে লাগিলেন। শেষে কেরাণীটি অপর কার্য্যে নিযুক্ত হইল দেখিয়া ও তাহার টেলিগ্রাম করার কার্য্য সমাধা হইল বুঝিয়া, তিনি বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। বাণ্ডে ক্ষণকাল মধ্যে সমুদ্র তীরবর্ত্তী আলোকস্তম্ভের নিকট তাঁহাদের বাসায় তাঁহাদিগকে পৌছিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—— :০: ——

ডিটেক্‌টিভদ্বয় অপরাধীর অন্বেষণে প্রথমতঃ দার্জ্জিলিং গিয়া, তথায় সপ্তাহকালের অধিক থাকিয়া; লিবং, জলাপাহাড়, কাটাপাহাড়, ভুটিয়াবস্তি জোড়বাংলা, ঘুম, চাঁদমারি ও দার্জ্জিলিং বাজার প্রভৃতি স্থান সমূহ তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া ও লোক সকলকে অপরাধীর অবয়বের যথাযথ বর্ণনা বিবৃত করিয়া সন্ধানে বিফল মনোরথ হইলেন।

এই কয়দিন প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহারা মলে যাইয়া, তাহার অনুসন্ধান করিতেন ও চৌরাস্তায় বেঞ্চে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া বাসায় ফিরিতেন।

এইরূপে সপ্তাহাধিককাল অতিবাহিত হইবার পর, একদিন উভয়ে কার্ট রোড ধরিয়া বাজারের মধ্য দিয়া বরাবর বার্চ হিলের দিকে যাইতে লাগিলেন। হিলের কাছাকাছি পৌঁছিয়া বড়ই শীত বোধ হওয়ায়, প্রৌঢ় গোয়েন্দা চা পান করিবার মানসে পথ পার্শ্বস্থ একটি পাহাড়ী-ল্যাপ্‌চার ক্ষুদ্র চায়ের দোকানে ঢুকিলেন। এবং বেঞ্চের উপর বসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে করিতে, কথাপ্রসঙ্গে ইপ্সিত ব্যক্তির অবয়ব বর্ণনা করিয়া, পাহাড়ীকে ঐরূপ লোকের কোন সন্ধান জানে কি না

জিজ্ঞাসা করায়, সে নিজ ভাষায় বলিল—

"হঁ হাজুর এক্ মহিনা অগাড়ি ঠিক এস্তই অনুহারকা এক্‌জানা ঠুলো মান্‌ছি, কতিদিন সম্মা এস্ ঠাঁওমা ঘুমদই ঘুমদই আকোথিও। আরু তিনিলে তিন চার দিন সম্মা মেরো দোকানমা আয়ের চিয়া খায়ো। তিনি সদৈ আপন্ন মন্‌মা কোনি কেকো বিচার গারি বাস্‌দা থিয়ো।

অহা তিনি খুবৈ ঠুলো মান্‌ছি থিও; অনি এক পিয়ালা চিয়া খাইকেন দুই আনা দেখি কামতি কাইলে পুনি দিন দেইন্ থিয়ো। তিস কারণ উনলই মাইলে সোধেঁ কি তাপাই এহাঁ কাতিদিন সম্ বাস্‌না ছেঁন্‌ছো ভান্‌দা। তিনিলে মলাই ভানেওকি এহাঁ দেখি সিলং জান্‌ছু, তাঁহা দেখি ওয়ালটিয়ার, অনি মদরাস জান্‌ছু ভানে।

অহা তিনি যেস্‌ত্ ঠুলো গহাক্ মেরো আঁখামা কাইলে পুনি ভেটেকো থিয়েনা।

তিনিকে তাপাঁইকো কোই আপনো মান্‌ছি পাড়্‌থিও কি?"

অর্থাৎ—হাঁ হুজুর, একমাস পূর্ব্বে ঠিক এই বর্ণনার মত একজন ভদ্র-লোক কয়েক দিন ধরিয়া এই স্থানে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। তিনি তিন চারি দিন আমার নিকট চা ও খাইয়া ছিলেন। লোকটী সর্ব্বদাই যেন কি চিন্তা করিতেন। আহা! তিনি খুব ভদ্রলোক ছিলেন। এক পেয়ালা চা খেয়ে দু'আনার কম কোনদিন আমাকে বকসিস্ করেন নাই। এই কারণে, তিনি আর কতদিন এখানে থাকিবেন জিজ্ঞাসা করায়, তিনি এখান হইতে শিলং যাইবেন ও তৎপরে ওয়ালটিয়ার ও মাদ্রাজ যাইবেন বলিয়াছিলেন। আহা! তাঁর মত ভাল খদ্দের আমার অদৃষ্টে প্রায় জোটে না। তাঁহার

অন্তঃকরণ খুবই উদার ; তিনি কি আপনাদের কোন আত্মীয় নাকি ?”

একটি ছোট “হুঁ” বলিয়া পাহাড়ীকে তাহার প্রাপ্য দিয়া উভয়ে প্রমোদ উদ্যান বাচাইল দর্শন পূর্ব্বক বাসায় ফিরিলেন ও পর দিনের মেলে তাঁহারা শিলং যাত্রা করিলেন।

অতি প্রত্যুষে শিলং মেল আমিনগাং ষ্টেশনে আসিয়া আরোহী-দ্বয়কে নামাইয়া দিল।

ষ্টেশনটি ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর কূলে স্থিত। এই স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোহর। নদের দক্ষিণকূলে ঘন বিটপি আচ্ছাদিত গাঢ় সবুজবর্ণ কামিক্ষা পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশ ধৌত করিয়া স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ সলিল রাশি বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক, ব্রহ্মপুত্রনদ অতি খরস্রোতে বহিয়া যাইতেছে দেখিলে, কাহার প্রাণে না আনন্দ অনুভব হয়। যাত্রীদ্বয় ব্রহ্মপুত্রের স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

স্নানান্তে তাঁহারা ষ্টিমারে উঠিলেন, এবং পরপারে পাণ্ডুঘাটে নামিয়া আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে আরোহণে গৌহাটি ষ্টেশনে অবরোহণ করিলেন। সেই দিন তথায় বিশ্রাম করিবার, এবং গৌহাটিতে ফেরার আসামীর সন্ধান করিবার ইচ্ছায়, তাঁহারা স্থানীয় ডাক বাংলোয় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন সার্ভিস্ মোটার আরোহণে ভ্রমণকারীদ্বয় আসামের রাজধানী পর্ব্বতোপরিস্থিত শিলংনগরে পৌঁছিলেন। এখানে দার্জ্জিলিং অপেক্ষা শীত অনেক কম, এবং প্রশস্ত লাল রংয়ের লম্বা লম্বা রাস্তাগুলি ও তাহার উভয় পার্শ্বে উন্নত পাইন বৃক্ষের সারি দেখিতে খুবই সুন্দর।

স্বপ্নদৃষ্টা

আসামীর সন্ধানে ক্ষুদ্র শিলংনগরী খুঁজিতে তাহাদের অধিক সময় লাগিলনা। সে কারণ তাঁহারা ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী চেরাপুঞ্জি পর্ব্বত ও গুহা দেখিবার ইচ্ছায়, একখানি মোটার ভাড়া করিলেন। চেরার সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ও প্রসিদ্ধ গুহা দর্শনান্তে ফিরিবার সময় পথে প্রকাণ্ড হস্তিপ্রপাত elephant fall দেখিতে গিয়া বরাবর পর্ব্বত গাত্র বহিয়া অনেকদূর নীচে নামিতে লাগিলেন। ফলের পার্শ্ব দিয়া, কোথায়ও বা cross bridge এর উপর দিয়া নিঃসারী জল প্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে নামিতে তাঁহাদের বড়ই আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। শেষে গাড়ীতে সেরূপ ভাল আলোর বন্দোবস্ত না থাকায় ও সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় দেখিয়া, তাঁহারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন।

শিলংয়ে সপ্তাহে, সপ্তাহেইবা কেন প্রত্যেক অষ্টম দিবসে হাট বসিয়া থাকে। অর্থাৎ এই সপ্তাহে যদি রবিবারে হাট হয়, তাহার পরবর্ত্তী সপ্তাহে সোমবারে ও তৎপরে মঙ্গলবারে; এই রকম হিসাবে বাজার হইয়া থাকে।

রবিবারে হাটের দিন থাকায়, ভ্রমণকারীদ্বয় হাট দেখিতে গেলেন ও তথায় পাইন বৃক্ষের কাণ্ড চিরিয়া উহা মশালের ন্যায় জ্বালাইবার অভিপ্রায়ে বিক্রয় হইতেছে দেখিয়া, কৌতুহল পরবশ হইয়া একজন বৃদ্ধ খাশিয়ার নিকট উহার কয়েক খণ্ড কিনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ নিকটবর্ত্তী তাহার দোকানে বেশ ভাল ভাল বেশী আঠাওয়ালা কাঠ আছে, এবং উহা খুব ভাল জ্বলিবে বলিয়া, উহাদিগকে দোকানে লইয়া গেল ও তথায় কথা প্রসঙ্গে বলিল—

"এই দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে শুক্রবারের হাটের দিন একজন বাবু

আমার কাছ থেকে এই রকম কাঠ নিয়ে গিয়েছেন। তিনি অতি ভদ্রলোক, সামান্য দুই তিন পয়সার কাঠ নিয়ে আমাকে চারি আনা দিয়ে গেলেন; বাবুটি যেন সর্ব্বদাই চিন্তিত! আমি তার পর দিন মোটার গোরেজে আমার একজন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে গিয়ে তাঁহাকে টিকিট কিনিতে দেখি; এবং বাবু কোথায় যা'বেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমার সহিত যেন আত্মীয়ের মত কতই আলাপ করিলেন ও শেষে বলিলেন যে তিনি এখান হইতে ওয়ালটিয়ায় যাইবেন।"

বৃদ্ধের মুখে সঠিক ঠিকানা পাইয়া, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে বিবেচনায়, ভ্রমণকারীদ্বয় পরদিনই সিলং পরিত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় দিবসে, অর্থাৎ বুধবার বৈকালে মাদ্রাজ মেলে উভয়ে ভাইজাগাপাটাম আসিয়া পৌঁছিলেন। ওয়ালটিয়ার ভাইজাগ মিউনিসিপ্যালিটীর একটী বিভাগ।

ওয়ালটিয়ার ওয়ার্ডটি ইউরোপীয়ানগণেরই একরকম খাস দখলে থাকায়, তথায় সুবিধা মত বাসার খুবই অভাব। একারণ ডিটেক্টিভদ্বয় ভাইজাগ লাইট হাউসের নিকট সমুদ্র তীরে একটী বাসা ভাড়া লইলেন।

কয়েক দিবস ভাইজাগে থাকিয়া, আসামীকে পাইবার প্রত্যাশায় গোয়েন্দাদ্বয় সমস্ত সহরটি তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা আসামীর তল্লাসে রাশিকৃত সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, পৌরাণিক সীমাচলম্ (প্রহ্লাদের নরসিংহাচল) পর্ব্বতোপরি উঠিয়াও তাহার সন্ধান করিতে ছাড়েন নাই।

সমুদ্রের দিকে ফিরিয়া লাইট হাউসের পাদদেশ হইতে দেখিলে, দক্ষিণদিকে একটী সুন্দর নাসিকার আকার বিশিষ্ট পর্ব্বত, যেন ক্রমশঃ

সমুদ্রগর্ভে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ পাহাড়টিকে ডলফিন্স-নোজ বলে। উহার উপর হইতে সমুদ্রের দৃশ্য অতীব মনোহর। চির বসন্তের আবাস ভূমি ওয়ালটিয়ার ভ্রমণে গেলে, প্রায় সকলেই ঐ নাসিকা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া থাকেন।

ভাইজাগের ব্যাক ওয়াটার একটী নালাদ্বারা সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত আছে। নৌকা যোগে ঐ নালাটি পার হইয়া ডলফিনস্ নোজে যাইতে হয়।

এই পাহাড়স্থ শিলা খণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া, এক দৃষ্টে সমুদ্রেরদিকে অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া থাকা অবস্থায় আমাদের গোয়েন্দা-দ্বয় অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

ফেরারি যুবককে ধৃত করিয়া, ডিটেক্‌টিভদ্বয় তাহাকে বাসায় লইয়া গিয়া, বিশেষরূপে নজরবন্দি রাখিলেন। পরে প্রাতঃকালে চিল্কা হ্রদের শোভা দেখিতে দেখিতে যাইবার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়, পরামর্শ স্থিরীকৃত হইল যে, পরদিন মেলে না গিয়া সেই রাত্রেই তাহারা সাড়ে আটটার এক্সপ্রেস রওয়ানা হইবেন।

কার্য্যে তাহাই হইল। অল্প সময়ের মধ্যে বিছানা কাপড় প্রভৃতি বন্ধন করিয়া, ও একখানি বাণ্ডে সাহায্যে যুবক ডিটেক্‌টিভ, আসামীকে সঙ্গে লইয়া তাহার অস্থায়ী বাসায় গিয়া, আসামীর কাপড় চোপড় গুছাইয়া লইল। তৎপরে বাড়ী ভাড়া মিটাইয়া দিয়া ও ঠিকা ঝি ভেন্‌কাটাসাম্মার প্রাপ্য ও কিঞ্চিৎ বকসিস্‌ তাহাকে দিয়া, উহারা সওয়া আটটার পূর্ব্বেই ওয়ালটিয়ার ষ্টেশনে পৌছিলেন।

বুকিং অফিস হইতে তিনখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া, সে রাত্রে ট্রেণে ভিড় কম থাকায়, আরোহিদ্বয় অত অল্প সময় বিধায় বার্থ রিজার্ভ করিতে বিফল মনোরথ হইয়াও, সৌভাগ্য ক্রমে সমস্ত কামরাটিই রিজার্ভ অবস্থায় পাইলেন।

রাত্রি প্রায় একটা পর্য্যন্ত আরোহীগণের কথা বার্ত্তায় কাটিল। তার পর ঘুমের পালা; প্রৌঢ় ব্যক্তি তিন জনের মধ্যে স্থূলকায় থাকা হেতু, তাঁহারই প্রথম নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে যুবক ডিটেক্‌টিভ মহাশয়ও ফেরারি আসামী পলাইয়া যাইবে কি না, সে বিষয় কোন চিন্তাও না করিয়া নিদ্রা দেবীর আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইলেন।

তখন আসামী বেচারা মনে ভাবিল যে এই দুই জন পাকা গোয়েন্দা যখন এত কষ্ট করিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিয়াও, বিশ্বাসের উপর ছাড়িয়া রাখিয়াছে, তখন বিশ্বাসঘাতকতা করাটা আমার উচিত হয় না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অপরাধী, ছাদের বৈদ্যুতিক আলোক দুইটিতে পার্শ্ব-বর্ত্তী সবুজবর্ণের আবরণ টানিয়া দিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

শীতের প্রাতঃকাল। সূর্য্যদেব যেন কোন মতেই লেপ ছাড়িয়া উঠিতে চাহেন না। বিহঙ্গমদল বিভিন্ন ভাষায় করুণ হইতে আরম্ভ করিয়া, অকৃতকার্য্যতার ক্ষোভে ও রোষে ক্রমশঃ স্বর চড়াইয়া চীৎকার করিয়াও যখন অরুণের ঘুম ভাঙ্গাইতে, বা তাহাকে লাল সালুর সদ্য-প্রস্তুত গরম লেপের আবরণ উন্মুক্ত করাইতে পারিল না; তখন অভিমান ভরে তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া, দল বাঁধিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। এই অবস্থা দেখিয়া সুচতুর বায়স বাহাদুরি লইবার ইচ্ছায় কঠোর চীৎকার দ্বারা বালতপনের কর্ণমূলে আঘাত করিতে লাগিল।

অরুণদেব হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায়, রাগে লাল হইয়া লেপ উন্মোচন পূর্ব্বক অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বাহিরে আসিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার দৃষ্টি উচ্চ

বৃক্ষগুলির নধর পল্লবের উপরি পতিত হইয়া, চিল্কা হ্রদের স্বচ্ছ সলিলে প্রতিফলিত হইতে না হইতে, ট্রেণ আসিয়া রম্ভা ষ্টেশনে থামিল।

আরোহীত্রয় ষ্টেশন হইতে হ্রদের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিয়া, অন্ততঃ একদিবস তথায় থাকিয়া হ্রদ মধ্যে নৌকা যোগে বিচরণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কাজেকাজেই তথায় অবরোহণ করিলেন।

ষ্টেশনের নিকটস্থ ডাক বাঙ্গলোয় আশ্রয় লইয়া, তাঁহারা সমস্ত দিন নৌকা ভাড়া করিয়া হ্রদে বেড়াইতে লাগিলেন, ও মধ্যে মধ্যে ঘন বৃক্ষ-রাজি সম্বলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরময় দ্বীপে উঠিয়া, ইতঃস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক সকলেই প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিলেন।

রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় রম্ভা ষ্টেশন হইতে মান্দ্রাজ মেলে উঠিয়া পর দিবস বেলা এগারটার সময় কলিকাতা মহানগরীতে প্রবেশ করিলেন।

কলিকাতায় কেবল মাত্র স্নান আহার ও স্বল্প বিশ্রামের পর, আর আদৌ বিলম্ব না করিয়া, অত্যাবশ্যকীয় সামান্য কয়েকটি দ্রব্য তাড়াতাড়ি কিনিয়া লইয়া, গোয়েন্দাদ্বয় আসামীকে লইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছি-লেন। তথায় ট্রেণে উঠিয়া সকলে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলেন।

ঐ দেখুন, ডিটেক্‌টিভদ্বয় আসামীর উভয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে যেন হড় হড় করিয়া টানিতে টানিতে, একটি নাতিবৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতলে সুসজ্জিত একটী কক্ষের মধ্যে লইয়া গেল। কি আশ্চর্য্য আসামীও ত' মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায়, ঠিক কাঁচপোকারদ্বারা ধৃত ফড়িং-টির মত বিনাবাক্যব্যয়ে উহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে।

আবার দেখুন, কক্ষ মধ্যে লইয়া গিয়া গোয়েন্দাদ্বয় আসামীকে একখানি মখমল মণ্ডিত সোফায় জোর করিয়া বসাইয়া দিল। এই সমস্ত অভিনয়ের কারণ কি? এত কষ্টে চোরকে ধৃত করিয়া আনিয়া তাহার প্রতি এত খাতির যত্ন প্রদর্শনই বা কেন?

আসামীকে সোফায় বসাইয়া দিয়া, প্রৌঢ় গোয়েন্দা প্রহরী স্বরূপ দ্বার সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইলেন। এবং গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

"অপরাধি! এক্ষণে তোমার পাপের শাস্তি লইবার জন্য প্রস্তুত হও, এই খানেই তোমার বিচার হইবে।"

আসামী শাস্তির অপেক্ষায় নীরবে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছে, এমন সময় "আসুন বেগম সাহেবা, আসামী হাজির" বলিয়া প্রহরী কাহাকে আহ্বান করিয়া সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটী অবগুণ্ঠনবতী যুবতী, ধীর পদ বিক্ষেপে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া জানিনা ভয়ে কি আনন্দে আসামীর বক্ষাভ্যন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল, ও আসামী সোফা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া নত মুখে ঘরের মেঝে ও নিজ পায়ের জুতার ফিতা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

যুবতীকে নির্ব্বাক অবস্থায় অনেকক্ষণ অপরাধীর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া, প্রহরী মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—

"বেগম সাহেবা এই চোর আপনার কি চুরি করিয়াছে? আপনি আমার ও চোরের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া বলুন।"

যুবতী একটু হাসিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ছোট্ট করিয়া বলিল "আমার যথা সর্ব্বস্ব।"

"ওহঃ! তা' হ'লে অপরাধ আমরা যতটা সামান্য মনে করে' ছিলাম তাহা নহে। চার্জ্জটা দে'খ্‌ছি গুরুতর। তা' হ'লে ইহার শাস্তিও সেই মত হওয়া দরকার। আর দেখুন বেগম সাহেবা, এই শ্বশ্রু-পুত্র চোর মহাশয় ধরা দিতে আমাদিগকে কম কষ্ট দেন নাই। সাজা দিবার সময় সে বিষয়টাও একটু বিবেচনা করা আবশ্যক। এখন কথা হচ্চে এই, বিচারটি কে ক'র্‌বে?"

"তা' সে ভারটা আমার হাতেই দিন্।" যুবতী লজ্জাজড়িত মৃদু-স্বরে বলিলেন।

"আচ্ছা তা'ই হউক" বলিয়া প্রহরী একটু গা ঢাকা দিল।

অবগুণ্ঠনবতী এক এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া, যেন অতি কষ্টে তাহার অবশ পদদ্বয় উঠাইয়া, অপরাধীর আরও নিকটবর্ত্তী হইল। ও ভয়ে বা অত্যধিক আনন্দে কম্পিত হস্তে নিজ কণ্ঠদেশ হইতে একছড়া মোটা মিশ্রিত পুষ্পের মালা লইয়া, যুবকের শিথিল হাত দু'খানি ধরিয়া বন্ধন করিবার ভঙ্গিমায় তাহাতে হার ছড়াটি জড়াইয়া দিল।

"ও'কি করেন, ও'কি করেন! একটু আস্তে বাঁ'ধবেন; অত শক্ত দড়িতে প্রাণ-চোরের হাত বাঁ'ধলে হাত যে কেটে যা'বে" বলিতে বলিতে ঘরের দোরটী সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া, রসিক গোয়েন্দা জোরে পা ফেলিতে ফেলিতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া যাইতে লাগিলেন।

নির্লজ্জ আসামী ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্যে ফুলের মালাটি যুবতীর গলদেশে পরাইয়া দিয়া, নিবিড় আলিঙ্গনে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

হারা মাণিক ফিরে পাওয়ায়, আনন্দে অধীর হইয়া মোমেনা

কাঁদিয়া ফেলিল। সুন্দরী শ্রেষ্ঠা সতীসাধ্বী পত্নীকে বুকে লইয়া, অনুতাপ-দগ্ধ আহম্মদ হোসেন আবেগভরে পত্নীর হাসি-কান্না মাখা শিশির-সিক্ত অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত গোলাপ কলিকার ন্যায় মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বহু দিনের সযত্ন সঞ্চিত পবিত্র চুম্বন বর্ষণে প্লাবিত করিয়া দিলেন।

এক্ষণে দুই কথায় আমরা প্রৌঢ় গোয়েন্দার পরিচয় পাঠক পাঠিকাকে দিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করি।

আমাদের প্রহরী বা প্রৌঢ় গোয়েন্দাটি কলিকাতা পুলিসের একজন পেন্সন প্রাপ্ত C. I. D. ইনেস্‌পেক্টার। গোয়েন্দাগিরীতে ইনি বিশেষ পারদর্শিতার সহিত কার্য্য করিয়া, গভর্ণমেণ্ট হইতে কয়েকবার কয়েকটি সুবর্ণ পদক ও একটী ঘড়ি, এবং শেষ অবস্থায় যাবজ্জীবন বিনা লাইসেন্সে যে কোন স্থানে ব্যবহার করিতে পারিবেন, এই মত একটী উৎকৃষ্ট রিভল্‌ভার ও তৎসঙ্গে খান্-সাহেব উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন।

মোমেনা খাতুনের মাতার ইনি খুল্লতাত। অকস্মাৎ বিপদের সংবাদ শুনিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃতনয়ার বাড়ীতে আসিয়া, মোমেনার ভ্রাতা আনিছুর রহমানের হাত ছাড়াইতে পারিলেন না। অগত্যা তাহার সহিত ডাক্তার সাহেবের অন্বেষণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া পারদর্শিতার সহিত কার্য্যোদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জব্বলপুরের মার্ব্বল-রক্ জগতে অদ্বিতীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যাগার। এই মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিবার জন্য সুদূর আমেরিকা-খণ্ড হইতেও পরিব্রাজকেরা এখানে আসিয়া থাকেন। এবং সেই কারণে জব্বলপুর ষ্টেশন হইতে সাতক্রোশ দূরবর্ত্তী এই জনমানবশূন্য পর্ব্বতময় স্থানে, লোকের থাকিবার সুবিধার্থে পাবলিক-ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট দুইটী উৎকৃষ্ট বাসোপযোগী ডাক-বাংলো প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এবং ভাড়া করিয়া উভয় পার্শ্বে মর্ম্মর প্রস্তরময় পাহাড়ের মধুর দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে, খরস্রোতা নর্ম্মদা নদীর প্রায় উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত যাইবার উপযোগী নৌকার বন্দোবস্ত ও ভেড়াঘাটে সর্ব্বক্ষণ ঠিক আছে।

আনওয়ার প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে, কলের জলে স্নান করিয়া ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, মার্ব্বল-রক্ ও নর্ম্মদা জলপ্রপাত দেখিতে যাইবার জন্য টাঙ্গা ভাড়া করিলেন।

বালক ভৃত্য জাফর সমভিব্যাহারে পথে যাইতে যাইতে, নিম্ন বঙ্গের water hycinth (বিলাতিপানা) পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নষ্টপ্রায় অব্যবহার্য্য দীর্ঘিকা সকলের পরিবর্ত্তে, রাস্তার দু'ধারে সেংহাড়া

গাছে আচ্ছাদিত পুষ্করিণী হইতে, ডোঙ্গা আরোহণে লাল রংয়ের কণ্টক-বিহীন পানিফল সকল তুলিতেছে বা মুট মুট শব্দে ভাঙ্গিতেছে দেখিতে দেখিতে, এবং মধ্য-প্রদেশের নূতন ধরণের পাহাড়গুলির অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইতে হইতে উচ্চ বাংলোয় পৌঁছিলেন।

পরে বিশ্রামান্তে বাংলোর রক্ষকের প্রতি মধ্যাহ্ন ভোজনোপ-যোগী আহার্য্য প্রস্তুতের অনুমতি করিয়া নৌকারোহণে মার্ব্বল পর্ব্বত দেখিতে গেলেন।

বোটে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ভ্রমণকারী নদীর একটি প্রশস্ত স্থানে পড়িলেন। মাঝি ঐ স্থানটীর নাম "দধিমন্থনকুণ্ড" বলিল। ঐ স্থানটির জল প্রায় স্থির ও খুব গভীর বলিয়া অনুমিত হইল। চতুর্দ্দিকের শ্বেত প্রস্তরের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনওয়ার বিমুগ্ধ হইয়া খোদা-তায়ালার মহিমার প্রশংসা করিতে করিতে, নৌকার মাঝিকে বক্‌সিসের প্রলোভন দেখাইয়া, সেই স্থানে কোন মতে নৌকা রক্ষা করিতে বলিলেন। মাঝিও পারিতোষিকের আশায় অতিকষ্টে পর্ব্বত গাত্রে লঙ্গর বদ্ধ করিয়া কিয়ৎক্ষণ তথায় নৌকা বাঁধিয়া রাখিল।

আনওয়ার আলি নর্ম্মদার স্বচ্ছ সলিলে অজু করিয়া, নৌকায় বসিয়াই খোদাতায়ালার উদ্দেশে দুই রেকায়াত শোকর-আনার নামাজ পড়িলেন। পরে মোনাজাত করিয়া উঠিয়া বিমুগ্ধ নেত্রে চতুষ্পার্শ্বস্থ উচ্চ শ্বেত পর্ব্বতের চাকচিক্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

মাঝিরা তাঁহার ইঙ্গিত মত নৌকা খুলিয়া বরাবর উত্তর দিকে দাঁড় টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আনওয়ার উভয় পার্শ্বে সুচিক্কণ আকাশভেদী শ্বেত পর্ব্বত গাত্রে, কোথায়ও নীলাভ, কোথায়ও বা

লোহিত আভাযুক্ত, কোনস্থানে হরিদ্রাবর্ণের এবং একস্থানে গাঢ় কৃষ্ণ মার্ব্বল যেন মানব হস্তদ্বারা পর্ব্বত গাত্রে সংলগ্ন করা রহিয়াছে দেখিয়া, বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন।

এক স্থানে নর্ম্মদা এত অপ্রশস্ত দেখিলেন যে উভয় পার্শ্ববর্ত্তী অত্যুচ্চ চূড়াদ্বয় যেন আর সামান্য অগ্রসর হইলেই পরস্পর সম্মিলিত হইয়া যায়। মাঝি তাঁহাকে ঐ স্থানটির নাম 'বান্দার-কুদ' অর্থাৎ বাঁদরের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে লাফাইয়া যাইবার স্থান বলিয়া পরিচয় দিল।

শেষে ভীষণ শব্দকারী প্রচণ্ড জল প্রপাতের দুই ফারলং দূর পর্য্যন্ত গিয়া, মাঝি আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। সেখানকার প্রখর স্রোত নৌকা চালনার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বিবেচনায়, আনওয়ার আলিও নৌকা ফিরাইতে বলিলেন।

দূর হইতে জল প্রপাতের দৃশ্য দেখিয়া ভ্রমণকারীর প্রাণে, নিকটে গিয়া নর্ম্মদা-ফল্ দেখিবার অভিলাষ বলবতী হওয়ায়, সে রাত্রে তিনি ঐ ডাক বাংলোয় অবস্থান করিলেন।

পরদিবস আনওয়ার আলি, জাফর ও ডাক-বাংলোর একজন ভৃত্যের সহিত মার্ব্বল-ফল্ দেখিতে গেলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলের ভিতর দিয়া অনেক দূর হাঁটিয়া গিয়া, সুদৃশ্য জলপ্রপাত দর্শনে তাঁহার নয়নের তৃপ্তি সাধন হইল ও পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিলেন।

আনওয়ার দেখিলেন, বিশাল জলরাশি বেগে প্রায় ত্রিংশ হস্ত নিম্নে যেন একটি গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া, উপরে মেঘের ন্যায় ধূম উদ্গিরণ করিয়া নিম্নদিকে বহিয়া যাইতেছে। সর্ব্বক্ষণ বাষ্প নির্গত হইয়া মেঘের আকার ধারণ করিয়া থাকায় ঐ স্থানটিকে "ধুঁআধার" বলে।

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে ঐ সমুদয় স্থানটিই শ্বেতবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরময়।

জলপ্রপাত দেখিয়া ডাক বাংলোয় ফিরিবার কালে আনওয়ার আলি পাহাড়ের উপর স্থাপিত নিম্ন হইতে একশত আটটি সিড়ির উপরস্থ চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির দেখিয়া আসিতে ভুলেন নাই।

সেই দিনই আনওয়ার জব্বলপুর ফিরিলেন। এবং প্রথমতঃ ডাকঘরে গিয়া তাঁহার নামের কোন পত্র আছে কি না অনুসন্ধান লইলেন। দেখিলেন যে পূর্ব্ব দিনে পৌছান, পোষ্টমাষ্টারের কেয়ারে তাঁহার নামের একখানি টেলিগ্রাম রহিয়াছে। ক্লার্কের হস্ত হইতে ঐ গাঢ় গোলাপি রংয়ের খামে মোড়া দ্রব্যটি লইয়া, তন্মধ্য হইতে ঐ রংয়েরই একখানি পেন্সিলে লেখা কাগজ বাহির করিলেন। উহাতে লেখা ছিল—

"Doctor recovered, Anis bringing him home from Waltair".

অর্থাৎ ডাক্তারকে পওয়া গিয়াছে, আনিছুর রহমান ওয়াল্‌টিয়ার হইতে তাহকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিতেছে।

টেলিগ্রামটি দেখিয়া উকিল সাহেব আনন্দে বিভোর হইলেন, এবং অজ্ঞাতসারে তাঁহার মুখ হইতে "আল্‌হামদো লিল্লাহ্‌" বাহির হইল।

সেইখান হইতেই তিনি দুইখানি টেলিগ্রামের ফরম্‌ লইয়া, এক-খানি নিয়ামৎ খাঁকে ও অপর খানি হাফেজ সাহেবের পুত্র আনিছুর রহমানের নামে নওয়াবপুরের ঠিকানায় লিখিয়া তার করিলেন। আর পূর্ব্বের খানিতে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের সঠিক সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

তৎপরে আরও কয়েকখানি পোষ্টকার্ড লইয়া. নিজ ভ্রাতা আফতাব আলি ও ভগ্নী, ভগ্নীপতিগণকে, এবং মোহরার হরপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিয়া, একখানি এনভেলপে বন্ধু ডাক্তার সাহেবকে তাহার শ্বশুরালয়ের ঠিকানায় নিজ প্রত্যাবর্ত্তন বার্ত্তা জানাইয়া দিলেন।

পোষ্ট অফিস হইতে ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া গিয়া, বিছানা পত্র বাঁধিয়া সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বোম্বে মেলে উকিল সাহেব গৃহ যাত্রা করিলেন।

পরদিবস বৈকালে আড়াইটার সময় ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিতেই, নিয়ামৎখাঁ সর্ব্বাগ্রে গিয়া গাড়ীর দরজা খুলিল ও কামরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, প্রথমতঃ উকিল সাহেবের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, এটা ওটা বাহির করিতে ও প্লাটফরমে দণ্ডায়মান পুরুষোত্তম মালীর হস্তে দিতে লাগিল।

এই ব্যস্ততার মধ্যে আনওয়ার আলি, ট্রেণের ভিতরেই নিয়ামৎখাঁকে স্নেহের কন্যা আয়েষার কুশল বার্ত্তা ও তৎসঙ্গে দুঃখীর মা প্রভৃতির কথাও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

নিয়ামৎ খাঁও ঐ সমস্ত দ্রব্য নামাইতে নামাইতে উত্তর দিতে লাগিল—

"খুকি তোমার গিয়ে প্রথম প্রথম, আপনার অদর্শনে তোমার গিয়ে বড়ই ঘাবড়েছিল। আমরা তাকে তোমার গিয়ে প্রত্যহ বৈকালে ষ্টেশনে গাড়ী করে বেড়াতে এনে, তোমার আব্বা আসবেন, তোমার জন্য তোমার গিয়ে কত খেল্না আনবেন বলে বুঝা'তাম। তা এখন তোমার গিয়ে আয়েষা ভাল আছে ও তোমার গিয়ে তাহার একটু ভুল পড়েছে।"

স্বপ্নদৃষ্টা

আনওয়ার আলি ট্রেণ হইতে নামিয়া আসিতেই, মহুরী হর প্রসন্ন পাদুকা উন্মোচন করিয়া একটু অগ্রসর হইয়া প্লাটফরমের লাল সুরকীর অর্দ্ধহস্ত ব্যবধান পর্য্যন্ত মাথা নোয়াইয়া একটী প্রণাম করিলেন ও কুশল জিজ্ঞাসাবাদ করিতে থাকা কালে পুরুষোত্তম নায়েক "বাবু আউচি বাবু আউচি" বলিতে বলিতে তাঁহার পায়ের নিকট আসিয়া "বাবু দণ্ডবত করে" বলিয়া একেবারে পপাত ধরণী তলে।

আনওয়ার আলি মালীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে উত্তোলন করিয়া, এই উভয়বিধ ভক্তিচিহ্ন প্রদর্শনে বিরক্ত হইয়া হর প্রসন্ন বাবু ও মালী দু'জনকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"আমি তোমাদের অচল প্রতিমা নহি, আমি সচল মনুষ্য মাত্র। পূর্ব্বেও তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছি যে, ঐ রকম করে প্রণাম ক'রোনা। এক জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, বিনাশ ও পালন কর্ত্তা ব্যতীত অপর কাহাকেও ওরূপ সেজ্‌দা করিতে নাই; বা ঐ সেজ্‌দা লইবার অধিকারও কাহারও নাই।

তোমারা আমাকে কেন সেজ্‌দা করিয়া পাপের ভাগী কর; আর যেন এমন কাজ না হয়।"

মালি পুরুষোত্তম এই সমস্ত তিরস্কার বা উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া, "বাবু তুমে কোয়াড় যাইথিল? মু ভাবিতে থিল। তুমে ভাল থিল না? মু ফুল গচ্ছড়ে রোজিনা পানি দিউছে। কিও তমু-নাগি বাপ্পো বাপ্পোকিড়ি রোজিনা কাঁদুচি" বলিয়া মুনিবকে আপ্যায়িত করিল বিবেচনায়, ক্ষিপ্র হস্তে জিনিষ পত্র গুছাইয়া প্লাটফরমের বাহিরে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে আনিয়া রাখিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—— :০: ——

অশ্বযান তীরবেগে ছুটিয়া অল্পক্ষণ মধ্যে আনওয়ার আলিকে তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিয়াদিল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভাড়াটিয়া গাড়ী জিনিষ পত্র ও মালী এবং জাফরকে লইয়া গেটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে, পুরুষোত্তম কোচম্যান ও জাফরের সাহায্যে গাড়ী হইতে সমস্ত দ্রব্য নামাইতে লাগিল। ইত্যবসরে নিয়ামৎখাঁ ভাড়া দিয়া গাড়ওয়ানকে বিদায় করিয়া দিল।

প্রথম গাড়ীটি আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে, ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাইয়া, দুঃখীর মা আয়েষাকে কোলে লইয়া উহার আবল-তাবল প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সদরে উপস্থিত হইল। আয়েষা অনেক দিনের পর হঠাৎ পিতাকে দেখিয়া, প্রথমতঃ বিস্ময় মিশ্রিত পুলকে স্তম্ভিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়া আনওয়ার আলির মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

এই সময়ে উকিল সাহেব "আয়েষা, মা তুমি আমাকে চিন্তে পা'চ্চ না?" বলিবা মাত্র আয়েষা একটা ঝাকানি দিয়া দুঃখীর মায়ের কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া "আব্বা বল ছুত্তুছেগে, আল্ আব্বাকে

দেতে দিব না' বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া পিতার উরুদেশ জড়াইয়া ধরিল।

আয়েষা পুনরায় দুঃখীর মার সহিত উপরে গিয়া পিতার কোলে গিয়া বসিল ও কচি মুখে কত কথা বলিতে আরম্ভ করিল; এ কথার অর্থও নাই, শেষও নাই।

অবশেষে পিতা পুত্রী একত্রে নাস্তা করিবার পর, আয়েষা দুঃখীর-মায়ের নিকটে ঘুমাইতে যাওয়ায়, তখন আনওয়ার আলি নিষ্কৃতি পাইলেন।

অনেক দিনের পর নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলে, চির পরিচিত ঘরও একটু নূতন নূতন ঠেকে। আনওয়ার আলিকেও তাঁহার নিজের ঘর সেইরূপ নূতন বোধ হইতে ছিল। তিনি মুগ্ধ-চঞ্চল-দৃষ্টিতে এঘর ওঘর দেখিয়া বেড়াইতে ছিলেন।

পরে বিশ্রাম কক্ষে আসিয়া আনওয়ার যখন মুখ তুলিয়া দেওয়াল গাত্রের সেই পুরাতন ছবিগুলির নূতনত্ব আবিষ্কার করিতে ছিলেন, সেই সময় পেছন হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া কে একজন তাঁহার উভয় চক্ষু চাপিয়া ধরিল। আনওয়ার আলি ক্ষিপ্রতার সহিত ঘুরিয়া, সম্মুখে প্রিয় বন্ধু আহম্মদ হোসেনকে দেখিতে পাইলেন ও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া, দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন।

তার পর বহু দিনের বিচ্ছেদ বেদনা, ছাড় পাইয়া উজ্জল মুক্তার আকারে দু'জোড়া চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। আবার তখনই বাদলের দিনের ঘনঘটার অন্ধকার ভেদ করিয়া, সূর্য্যিমামার টু-দেওয়ার ন্যায়, উভয়ের মলিন-মুখে সাবেক হাসি ফুটিয়া উঠিল।

স্বপ্নদৃষ্টা

ডাক্তার আহম্মদ হোসেন শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, পরদিন জব্বলপুরের ঠিকানায় আনওয়ার আলির নামে, "তোমার স্বপ্নদৃষ্টা পাইয়াছি, তুমি শীঘ্র এস" বলিয়া একখানা টেলিগ্রাম করেন। কিন্তু উহা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই উকিল সাহেব জব্বলপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এদিকে তাঁহার শ্বশুরের পাঠান টেলিগ্রাম পাইয়া আনওয়ার আলি জব্বলপুর ছাড়িয়া আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, ডাক্তার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আর বিলম্ব না ক'রিয়া শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে যাহা যাহা ঘটিল ভগ্নী পাঠিকা ও পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন।

আহারাদির পর দু'জনে অনেক কথার আলোচনা করিলেন। অতঃপর ডাক্তার বলিলেন "দেখ ভাই আমি পাত্র পাত্রী উভয়পক্ষেই থা'ক্‌ব তোমার ভগ্নীদ্বয়কে এখানে আনিবার জন্য আফতাব আলিকে পত্র লিখে, আমি একবার বাড়ী যা'ব। সেখা'নে মা বাপের কাছে ক্ষমা চেয়ে আর তাঁহাদের স্নেহ জনিত কষ্ট সুদ সমেত আদায় করে দিয়ে, সেখান থেকে সপ্তাহ পরে গিন্নীর কা'ছে গিয়ে, তার ছোট বোনের বর আন'বার জোগাড় পত্র ক'রব। কেমন ব্যবস্থা ভাল নয়?"

"ভাল বলে ভাল, সাজ্যাতিক ভাল; তবে তার চেয়ে ভাল হ'ত যদি বাড়ী থেকে ফিরে এসে, একটা সপ্তাহ এ গরীবের বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে, ঐ কটা দিন আমাকে অতিথি সৎকারটা ক'রতে দিতে। নিশ্চয়ই তাঁদের কদমবুচি না ক'রতে দিয়ে, এত দিনের ফেরারি আসামীকে আমি যে এখানে গোপন করে রেখে, একটা ফৌজদারি অপরাধ কর্‌'ব তত আহম্মক আমি নই।"

স্বপ্নদৃষ্টা

পরের দিনই ডাক্তার নিজের দেশে চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে আসিয়া আহম্মদ হোসেন পিতা মাতার স্নেহ উপভোগ করিয়া, যাই যাই করিয়াও দুই সপ্তাহের পূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিতে পারিলেন না।

মাঘ মাসের অর্দ্ধেক অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর তিনি শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিলেন ও অনেক সাধ্য সাধনার পর, চারি দিন পরে গৃহিণীর নিকট ছুটি মঞ্জুর করাইয়া আবার বন্ধুর বাড়ীতে আসিয়া দেখা দিলেন। তথায় এক সপ্তাহ থাকিয়া বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের পাণ্ডুলিপি ও ধার্য্য দিন সম্বন্ধে আনওয়ার আলির অনুমোদন করাইয়া, পত্র ছাপান ও বিতরণাদি কার্য্য করিতে লাগিলেন।

উকিল সাহেবের বাড়ী হইতে ডাক্তার কলিকাতায় গিয়া, দু'এক দিন তথায় থাকিয়া বিবাহোপযোগী সমস্ত সওদাপত্র করিয়া লইয়া পুনরায় শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিলেন।

সুখের দিন বড়ই শীঘ্র চলিয়া যায়। বিবাহের ধুম-ধামে বর-ক'নের আত্মীয় স্বজনগণের গমনাগমনে, সদর দরজায় গাড়ী পাল্কির ভিড়ে, এই সকল আনন্দের মধ্য দিয়া মাঘ মাস চুপি চুপি সরিয়া পড়িল।

শীতের জড়তা অপসারিত করিয়া, আনওয়ার আলির স্বপ্নদৃষ্টা রশীদা খাতুনকে বধূরূপে সাজাইবার জন্য, সহচরী পরিবেষ্টিতা হইয়া রাণী সাজে হাসি মুখে নব বসন্ত আসিয়া দেখা দিল।

মহা সমারোহে ফুলের সৌরভে, মধুর পবনে, ভ্রমর গুঞ্জনে, পাপিয়ার তানে, কোকিলের গানে, জ্যোৎস্না কিরণে, পবিত্র বিবাহ বন্ধনে, নববধূ রশীদা সুন্দরী আসিয়া আনওয়ার আলির আঁধার ঘর রওশন করিল। ইতি –

৬ই সফর, ১৩৪২ হিঃ

Published by—
Kazi Gholam Muhammad.
Noor Cottage,
SERAMPORE.

Printed by
Manmatha Natha Goswami.
TOWN PRINTING WORKS
SERAMPORE.

লেখিকার দ্বিতীয় উদ্দম, ঐতিহাসিক কাহিনী

"জানকী বাঈ"

আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে শীঘ্র বাহির হইবে ৩।১১।৩০।

প্রাপ্তিস্থান।

১। কাজি গোলাম মহম্মদ
"নূরকুটীর"
শ্রীরামপুর।

২। সরকার ব্রাদার্স এণ্ড কোং
বুক সেলার্স এণ্ড পাবলিসার
৫৪।৮ কলেজ ষ্ট্রীট
(কৃষ্ণ দাস পালের প্রতিমূর্ত্তির নিকট)
কলিকাতা।